গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১৯ - ২৫ মে, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বিধানসভা নির্বাচন ২০০৬

ভোটের ফলাফলে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে কি ?

২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে সিপিএম-ফ্রন্ট আবার বিপুল ভাবে জয়ী হয়ে সরকারে বসেছে। ২৯৩টি আসনের মধ্যে তারা পেয়েছে ২৩৫টি আসন, একটি আসনে প্রার্থীর মৃত্যুর জন্য ভোট হয়নি। বাকি মাত্র ৫৮টি আসন অন্যদের মধ্যে ভাগ হয়েছে। তৃণমূল ২৯, কংগ্রেস ২১, আমাদের দল এস ইউ সি আই ২, জি এন এল এফ ৩ এবং মুর্শিদাবাদে তথাকথিত নির্দল ৩। ফলে সব দিক দিয়েই সিপিএম ফ্রন্টের জয়জয়কারই হয়েছে। সিপিএম-এর এই বিপুল জয় যদি জনগণের ভোটেই ঘটে থাকে, তাহলে জনগণের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক। অথচ, বিস্ময়ের কথা, এই ফলাফল নিয়ে রাজ্যের জনগণের মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস আনন্দ নেই। সিপিএম-এর হাল আমলের কিছু কর্মী-সমর্থকদের বাদ দিলে তাদের পুরনো ও প্রবীণ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে চাপা বিস্ময়। কী করে এমন ঘটেছে ?

ভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশনের হৈচৈ, সি পি এম নেতৃত্ব ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে যুদ্ধের নাটক, সংবাদমাধ্যমে সিপিএমের পক্ষে ও বিরোধীদের বিপক্ষে একটানা প্রচার, বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার এতদিনকার রীতি-রেওয়াজের অনুপস্থিতি ইত্যাদি মিলিয়ে এবারকার ভোটের ফলাফল নিয়ে 'কী হয়, কী হয়' ভাব খুব ভালরকম সৃষ্টি হয়েছিল। ফল ঘোষণার আগের দিন হাটেবাজারে, পাড়ায় পাড়ায়, যুবকদের জটলায়, সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় একটি প্রশ্নই ঘুরে ফিরে উঠেছে — 'ভোটের ফল কী হবে'। সংবাদমাধ্যমে সিপিএম-এর বিপুল জয়ের যত ভবিষ্যদ্‌বাণীই করা হোক, সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করেনি। তাদের বলা ও না-বলা প্রশ্ন ছিল — সিপিএম সরকার কি এবার হেরে যাবে ? যদি সেটা নাও ঘটে, কত আসন কমবে ওদের ? সিপিএম-এর কর্মী-সমর্থকরাও স্বস্তিতে ছিল না। তাদের খোঁজখবর রাখা কর্মীরা জেলা ধরে ধরে হিসাব কষে ধরে নিয়েছিল, ফ্রন্ট যদি আবার সরকার করেও, তাদের আসন অনেক কমে যাবে। অনেকে পরাজয় সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, ফল ঘোষণার আগের দিন ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। অথচ, ১১ মে ভোট গণনা শুরু হতেই দেখা গেল, সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা, সকল ভাবনাধারণা হিসেবনিকেশ উল্টে দিয়ে সিপিএম-ফ্রন্ট সর্বত্র জিতছে। এমন কাণ্ডকে জনগণ কিছুতেই যুক্তিবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে মেলাতে পারছে না। তাই, আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে বিস্মিত হতচকিত জনগণ পথেঘাটে বাসে-ট্রেনে একেবারে মূক হয়ে গেছে, ভোটের ফলাফল নিয়ে কারও যেন কোনও আগ্রহ-উৎসাহ নেই, একান্ত কথাবার্তায় সকলের মধ্যেই শুধু বিস্ময় আর বিস্ময়।

কিন্তু উল্লাস কি কোথাও নেই ? অবশ্যই আছে। সিপিএম নেতাদের বাদ দিলে ফ্রন্টের এই বিজয়ে যারা সবচেয়ে বেশি উল্লাস প্রকাশ করেছে, তারা হল, দেশের একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলি, আম্বানি-টাটা-গোয়েঙ্কার মতো একচেটে পুঁজিপতিরা, দেশের প্রায় সমস্ত বণিকসভা। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিও যে এই জয়ে খুশি, সেটাও ইতিমধ্যে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ভোটের ফল দেখে জনসাধারণ যখন বিস্ময়ে নির্বাক, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন তখন ঝরে পড়ছে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের উপর। তারা একবাক্যে সিপিএম সরকারের শিল্প ও আর্থিক নীতির, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাস্তববাদী কর্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসায়

পাঁচের পাতায় দেখুন

জয়নগর, কুলতলিতে এস ইউ সি আই জয়ী
প্রায় সব আসনেই ভোট বেড়েছে

সিপিএম বলেছিল, জয়নগর ও কুলতলি থেকে এস ইউ সি আই-কে তারা উৎখাত করবে। তার জন্য চেষ্টার তাদের কসুর ছিল না। কিন্তু এবারও তারা ব্যর্থ হয়েছে।

গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের সমর্থনই আমাদের শক্তি, যেমন আন্দোলনে, তেমনই ভোটেও। সেই শক্তিতেই এবারও এস ইউ সি আই জয়নগর ও কুলতলিতে বিজয়ী হয়েছে।

বহু লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা এস ইউ সি আই-এর সংগঠন ভাঙতে সিপিএম একদিকে যেমন দলের বহু নেতা-কর্মীকে খুন করেছে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন

তিনের পাতায় দেখুন

বৈদ্যুতিন ভোট ব্যবস্থা ঃ কিছু তথ্য

বৈদ্যুতিন ভোট ব্যবস্থা (ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম) ভারত ও ব্রাজিলে বহুল ব্যবহৃত হলেও বহু দেশে, বিশেষ করে ইউরোপের ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশগুলিতে পুরনো প্রথায় নিজ সমর্থনের প্রার্থীর নাম বা চিহ্নের উপর হাত দিয়ে স্ট্যাম্প লাগানো ও হাতে গণনার ব্যবস্থাই এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

ভোট দেওয়ার সময় ভোটারের হাতে নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম ও চিহ্ন সম্বলিত ব্যালটপত্র থাকা দরকার যাতে তিনি নিজেই তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। তিনি যাঁকে ভোট দিলেন, সত্যই তাঁকে দিলেন কি না, তাও তিনি সঙ্গে সঙ্গে দেখে ও পরখ করে নিতে পারেন। তারপর যা ঘটে অর্থাৎ গণনার কাজ — তাঁর হাতে না থাকলেও তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, যিনিই গণনায় থাকুন না কেন, তিনি ঠিক তাঁর প্রার্থীর পক্ষে একটি ভোট যোগ করবেন। তা না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা করার কাজটিতে প্রথমেই ভোটার তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার হারান।

কিন্তু ভোট সংক্রান্ত উপরোক্ত বিষয়গুলি, প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ঘটলেও নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায়। তাছাড়া যন্ত্রের ভেতরে ভোট দেওয়ার পর কী ঘটল তাও সম্যকভাবে ভোটারের জানার উপায় নেই।

দুয়ের পাতায় দেখুন

সাধারণ গ্রাহকদের সামান্য কমিয়ে শিল্পপতিদের বিদ্যুৎ মাশুলে বেশি ছাড়

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি গত ৯ মে এক বিবৃতিতে বলেন, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ঘোষিত ২০০৬-০৭ সালের বিদ্যুৎ মাশুল চূড়ান্ত জনবিরোধী। তিনি বলেন, অ্যাবেকার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের চাপে এবারে গড় মাশুল কিছুটা কমেছে; সাধারণ গ্রাহক পেয়েছে ছিটেফোঁটা, কিন্তু তার সম্পূর্ণ সুফলটা তুলে দেওয়া হয়েছে দেশিবিদেশি শিল্পপতিদের হাতে। যেখানে গড় মাশুল ৭/৮ পয়সা ইউনিটে কমেছে সেখানে সাধারণ গ্রাহকদের এক/আধপয়সা কমিয়ে শিল্পপতিদের কমানো হয়েছে প্রতি ইউনিটে ২৫ থেকে ৩৫ পয়সা পর্যন্ত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, রাস্তার আলো, জলশোধনাগার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মাশুল বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে — যা ঘুরে ফিরে সাধারণ মানুষের ঘাড়েই চাপবে। গত বছর কৃষক মারা মাশুলের কথা মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন এবং আন্দোলনের চাপে পড়ে ২০ কোটি টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করায় গত বছর মাশুল কমেছিল ২০০০ টাকা গ্রাহক পিছু। এবছর ভর্তুকি তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই অবস্থায় মাত্র ১৫০/২০০ টাকা বাৎসরিক কমানোয় বাস্তবে কৃষিতে ৯৯% বৃদ্ধি ঘটেছে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

অধিকার রক্ষার দাবিতে মে দিবসে শ্রমিক মিছিল। (বামদিকে) বেলারি, কর্নাটক ও (ডানদিকে) নাগপুর, মহারাষ্ট্র।

টালিগঞ্জে মদের দোকান বন্ধ হল

টালিগঞ্জের সূর্যনগরে দীর্ঘ ৬৫ দিন পিকেটিং চলার পর বিপ্লবী সূর্য সেনের মূর্তির সামনে মদের দোকান বন্ধ হল। এই জয় অর্জিত হয়েছে এলাকার সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চাপে।

এলাকার মধ্যে একটি আবাসনের গ্যারেজে মদের দোকান হওয়ার সংবাদ পাওয়ামাত্রই এলাকার মানুষ প্রতিবাদ জানায়। স্থানীয় কাউন্সিলারসহ সিপিএমও হাওয়া বুঝে শুরুতে প্রতিবাদ জানায়, স্বাক্ষর সংগ্রহ করে। আমাদের দলের যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকেও স্বাক্ষর সংগ্রহ হয়। কিন্তু সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে ৩ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন দোকানটি খুলে যায়। অদ্ভুতভাবে সিপিএম নেতৃত্ব আবগারি দপ্তর ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিপ্লবী সূর্য সেনের সহযোদ্ধা প্রবোধরঞ্জন সেন সহ আরও অনেক বিশিষ্ট মানুষ প্রতিবাদী স্বাক্ষর দেন। ২২ মার্চ সূর্য সেনের জন্মদিনে সভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও আইনজীবী পৃথ্বীশ বাগচী; সারা বাংলা সূর্য সেন জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য প্রমুখ। আন্দোলন চলাকালীন ভয় দেখানো, টাকার লোভ দেখানো সত্ত্বেও আন্দোলনকারীদের অনমনীয়তার তাঁরা প্রশংসা করেন ও আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন।

আন্দোলনের চাপে আবগারি দপ্তর থেকে পরিদর্শক পাঠানো হয়। কিন্তু আন্দোলনকারীদের

নীরব হয়ে যায়। এ অবস্থায় হতাশ এলাকাবাসীর পাশে দাঁড়ায় গণসংগঠন ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, এম এস এস। ৮ ফেব্রুয়ারি আধঘণ্টা রাস্তা অবরোধ হয়। পরদিন থেকে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শুরু হয় লাগাতার পিকেটিং। ১৩ ফেব্রুয়ারি দলমত নির্বিশেষে এলাকার সাধারণ মানুষ গড়ে তোলেন 'সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটি।' এই কমিটির নেতৃত্বে স্থানীয় স্কুল-ছাত্রছাত্রী ও এলাকার মহিলাদের নিয়ে পথ অবরোধ হয়। স্থানীয় সিপিএম এবং তৃণমূল নেতৃত্ব আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে না এসে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এলাকার মানুষ এস ইউ সি আই-এর প্রতি আস্থাজ্ঞাপন করে একে একে পিকেটিং-এ এসে যোগ দেন। সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে মালিকপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে তদন্ত রিপোর্ট তৈরি হয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এলাকার মহিলারা জোটবদ্ধভাবে প্রতিবাদপত্র নিয়ে গেলে সেই তদন্তকারী অফিসারকে সরিয়ে নতুন অফিসার নিয়োগ করা হয়। এরপর তদন্ত রিপোর্টে উঠে আসে প্রকৃত তথ্য — দোকানটির ১০০০ ফুটের মধ্যে রয়েছে তিনটি স্কুল — যা সম্পূর্ণ বেআইনী। এরপর দীর্ঘ ৬৫ দিন পিকেটিং-এর পর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দোকানটি বন্ধ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হন।

এই ঘটনায় সমগ্র এলাকা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজ্য সরকারের মদের ঢালাও লাইসেন্সের নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের এই জয় অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

সাধারণ গ্রাহকদের সামান্য কমিয়ে শিল্পপতিদের বিদ্যুৎ মাশুলে বেশি ছাড়

একের পাতার পর

তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এবছর ভর্তুকি বন্ধ করে দিয়ে সরকারের জনবিরোধী চরিত্রকেই প্রকট করেছেন শুধু তাই নয়, এই জনবিরোধী মাশুল নির্ধারণের ঘোষণা ভোট পর্যন্ত আটকে রেখে গদি দখলের স্বার্থ বজায় রাখতে মরিয়া হয়েছেন। সমগ্র বিষয়টিকে বিকৃত করে মাশুল কমে গেছে বলে প্রচার করে রাজ্যবাসীকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আমরা এই জনবিরোধী মাশুল ঘোষণা বাতিলের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে, বিদ্যুৎ আইনের ১০৮নং ধারা প্রয়োগের দাবি জানাচ্ছি। সাথে সাথে দাবি জানাচ্ছি—

১। মাশুল নির্ধারণে শুনানি করে এবং স্বচ্ছতা এনে গড় মাশুল ২ টাকা করতে হবে।
২। কৃষিতে ৯৯% মাশুলবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে।
৩। সাধারণ গৃহস্থ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্পে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে।
৪। অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে বিদ্যুৎ মাশুলে ১০০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে।
৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদির মাশুলবৃদ্ধি প্রত্যাহার করতে হবে।

উপরোক্ত দাবিতে ১০ মে সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়, ঐদিন রাজ্যের সর্বত্র ঘোষণাপত্র পুড়িয়ে বিক্ষোভ, অবরোধ ইত্যাদি সংগঠিত করা হয়। ঐদিন কলকাতায় ভিক্টোরিয়া হাউস সংলগ্ন ক্যাশ কাউন্টারের সামনে বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি। কলকাতা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় এই কর্মসূচিতে গ্রাহকরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

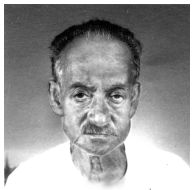

বর্ধমান জেলায় এস ইউ সি আই-এর সংগঠক কমরেড তারাপদ পাকড়ে গত ৮ এপ্রিল বর্ধমান মেডিকেল কলেজে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানা এলাকায় এক সময় সিপিএম সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর আটের দশকে বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত ভাষা ও শিক্ষানীতি তিনি মেনে নিতে পারেননি। যখন সরকারে থাকার সুবাদে সিপিএম কর্মীরা নিজেদের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত সেই সময় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কমরেড তারাপদ পাকড়ে এস ইউ সি আই দল ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। নিজের শরীর পাত করে তিনি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীর রোগগ্রস্ত হলেও তাঁর মন ছিল প্রাণচঞ্চল, মুখ ছিল হাস্যময়। এস ইউ সি আই বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করা হয়। গত চৌদ্দই এপ্রিল সকালে স্থানীয় আঁটপাড়া হাটতলাতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

তথাকথিত উন্নয়নের প্রতিফলন শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নেই

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী উল্টাডাঙা-কাঁকুড়গাছি-সল্টলেক জোনাল কমিটির ডাকে গত ১০ মে কলকাতার বাগমারি বাজারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, মালিকের শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিরোধের যে জোয়ার মে দিবসে সূচিত হয়েছিল আজ তা নতুন প্রেক্ষাপটে আরও অনেক প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে শ্রমিকদের সামনে উপস্থিত। বর্তমান সময়ে তথাকথিত বিশ্বায়নের নীতি শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনে নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। কল-কারখানায় ব্যাপক ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার, 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক', 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতি' নিম্নতম মজুরি না দেওয়া, অর্জিত অধিকার হরণ, স্থায়ী চাকরি বিলোপ ও ধীরে ধীরে সর্বত্র চুক্তিভিত্তিক কাজ চালু করা, দৈনিক সর্বাধিক আট ঘণ্টার শ্রমদিবস যা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মে দিবসের ঐতিহাসিক লড়াই হয়েছিল — সেটাকেও ভেঙে দেওয়া, বিশেষ অর্থনৈতিক জোন ঘোষণা করে সেই এলাকায় শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়া, এমনকী ট্রেড ইউনিয়ন করতে না দেওয়া — আজ শ্রমিকদের জীবনে এই হল সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আক্রমণের ভয়ঙ্কর রূপ। কংগ্রেস, বিজেপি, প্রমুখ চিহ্নিত বুর্জোয়া দল ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিই শুধু নয়, বামপন্থী নামধারী রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার ও সিপিএমের নেতৃবৃন্দ 'দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন'-এর নামে মালিকদের নির্লজ্জ দালালি করছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইগুলিকে পিছন থেকে ছুরি মারছে।'

সভায় আমন্ত্রিত বক্তা এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ও উল্টাডাঙা-বেলেঘাটা লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় চক্রবর্তী বলেন, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার উন্নয়নের ফানুস উড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনে এই 'উন্নয়ন'-এর কি কোন প্রতিফলন আমরা দেখছি? সেখানে এর কোন প্রতিফলন নেই। বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, উচ্ছেদ বাড়ছে। এর মূলে রয়েছে যে পুঁজিবাদ তার বিরুদ্ধে সঠিক লাইনের ভিত্তিতে লড়াই জোরদার হওয়া দরকার।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর কোলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও জোনাল কমিটির সম্পাদক কমরেড শ্যামল দত্ত।

বৈদ্যুতিন ভোট ব্যবস্থা ঃ কিছু তথ্য

একের পাতার পর

এরপর আর একটা কথাও বোঝা দরকার। অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন ডিজিটাল প্রযুক্তি সমৃদ্ধ যন্ত্রের দুটি অংশ থাকে। একটি তার যান্ত্রিক অংশ, যার মধ্যে থাকে সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তৈরি নানা উপাদান। আর অন্যদিকে যন্ত্রটিকে দিয়ে যা করানো হবে তার উপযুক্ত এক ব্যবস্থা, অর্থাৎ যার মাধ্যমে যন্ত্রটিকে প্রয়োজন মতো চালানো যাবে। যান্ত্রিক অংশটিকে বলে হার্ডওয়ার, আর যার মাধ্যমে চালানো হয় তাকে বলে সফ্‌টওয়ার। এই সফ্‌টওয়ারেই নির্দেশ থাকে যাতে ভোট দিলে ভোট জমা থাকে, কাকে দেওয়া হল তাও জমা থাকে। এই নির্দেশ যেমনটি প্রয়োজন তেমন ভাবেই দেওয়া সম্ভব। এমনকী যেকোন বোতাম টিপলে কোনও একজন বিশেষ প্রার্থীর সমর্থনে সেই ভোট এনে ফেলা কোনও ব্যাপারই নয়।

বেশিদিন আগের কথা নয়। ২০০০ সালে যে জর্জ বুশ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন, তার মধ্যেও অনুরূপ অসাধুতার অভিযোগ ওঠে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিন ভোট ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যাপক কারচুপির আয়োজন ছিল। এ'খবর সে'সময় এ'দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও ঠিক কীভাবে কারচুপি হয়, তার বিবরণ ছিল না। বৈদ্যুতিন ভোটব্যবস্থার পরিচালনার জন্য ফ্লোরিডার ইয়াং এন্টারপ্রাইজেস নামে এক সংস্থার কাছ থেকে মার্কিন সরকার বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও কম্পিউটার সংক্রান্ত নানা সাহায্য ও পরামর্শ নিত। রিপাবলিকান টম ফিনে, ক্লিন্ট কার্টিস নামের এক সফ্‌টওয়ার বিশেষজ্ঞকে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ভোটিং মেশিনের জন্য এমন একটি প্রোগ্রাম লিখে দিতে বলেন যার সাহায্যে নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে বুশের পক্ষে আনা যায়। এমনভাবে করা হবে কোনও চিহ্নই যার থাকবে না। কার্টিস যে হলফনামা ১৩ ডিসেম্বর ২০০৪-এ হাউস জুডিসিয়ারি কমিটির কাছে পেশ করেন, তাতেই তাঁর স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়। কাজেই বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট হলেই তাতে কারচুপি থাকতে পারে না — এই বহুল প্রচলিত ধারণা বিজ্ঞানসম্মত নয়। যাকে ইচ্ছা ভোট দেবার অধিকার যেমন ভোটারদের থাকা দরকার তেমনই যাঁকে ভোট দিলাম তিনিই পেলেন — এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার অধিকারটাও মৌলিক অধিকার। বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্র যা দিতে পারে না।

প্রায় সব আসনেই এস ইউ সি আই-এর ভোট বেড়েছে

একের পাতার পর

কারাদণ্ড করিয়েছে, অন্যদিকে নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ ও পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির চর্চার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত অনৈতিক জীবনযাত্রার প্রসার ঘটিয়ে মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ড ধসিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে জনজীবনের প্রতিটি সমস্যা সমাধানের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এস ইউ সি আই। শ্রেণীচেতনার বনিয়াদে গড়া ওঠা এই সংগ্রামই এস ইউ সি আই-কে জয়ী করেছে।

২০০১ সালে এস ইউ সি আই ৮৫টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ১২৭টি কেন্দ্রে। ৮২টি কেন্দ্রে যেখানে ২০০১ সাল এবং এবার — দু'বারই আমরা লড়েছি, তার তুলনামূলক হিসাবে দেখা গেছে, সামগ্রিকভাবে ৩৬ শতাংশ ভোট বৃদ্ধি হয়েছে।

	২০০১	২০০৬	সংখ্যায় বৃদ্ধি	শতাংশ বৃদ্ধি
৮২টি কেন্দ্রের (যেখানে ২০০১ ও ২০০৬ সালে আমরা লড়েছি) প্রাপ্ত ভোট	২,৯৮,৫৮২	৪,০৬,২০৯	১,০৭৬২৭	৩৬%
১২৬টি কেন্দ্রে প্রাপ্ত মোট ভোট	—	৫,১৪,০০১	—	—

জেলা	কেন্দ্র	প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট ২০০১	২০০৬
দার্জিলিং				
১।	শিলিগুড়ি	কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য	—	৩,৬৯৯
২।	ফাঁসিদেওয়া (তপঃ উপ)	কমরেড মহেন্দ্র ভগত	১,৮৭০	২,২৭৩
কোচবিহার				
৩।	মেখলিগঞ্জ (তপঃ)	কমরেড প্রমীলা রায়	২,৪৩৪	৪,৯৪৩
৪।	মাথাভাঙা (তপঃ)	কমরেড মানিক বর্মন	—	২,৬৩৫
৫।	কোচবিহার পশ্চিম	কমরেড নৃপেন কার্জি	২,০৮৪	৩,২২২
৬।	সিতাই	কমরেড অনিল বর্মন রায়	১,১৯৪	৩,৮৭৫
৭।	তুফানগঞ্জ (তপঃ)	কমরেড দেবেন্দ্রনাথ বর্মন	১,৩০১	১,৬৯৯
জলপাইগুড়ি				
৮।	আলিপুরদুয়ার	কমরেড অভিজিৎ রায়	২,৪২৯	২,৫৪৯
৯।	ফালাকাটা (তপঃ)	কমরেড তরণী রায়	১,১৭৩	২,১৪৫
১০।	রাজগঞ্জ (তপঃ)	কমরেড ভোগীন্দ্রনাথ রায়	৪,০৯৮	৩,৮৫০
১১।	জলপাইগুড়ি	কমরেড সুব্রত দত্তগুপ্ত	১,৮৭৮	১,৩৮৫
১২।	ময়নাগুড়ি (তপঃ)	কমরেড সুরেশ রায়	২,৮১৭	২,৯৯৪
১৩।	মাদারিহাট (তপঃ উপ)	কমরেড গোপাল ওঁরাও	—	৩,১০৪
১৪।	ধূপগুড়ি (তপঃ)	কমরেড নিরঞ্জন রায়	—	১,৭৯৬
১৫।	কালচিনি	পরমেশ্বর টপ্পো	—	৩,৬৮৪
দক্ষিণ দিনাজপুর				
১৬।	কুমারগঞ্জ (তপঃ)	কমরেড নন্দা সাহা	৯৮৩	২,৬৯৬
১৭।	তপন (তপঃ উপ)	কমরেড কালিদাস টপনো	—	২,৬৮১
উত্তর দিনাজপুর				
১৮।	করণদীঘি	কমরেড মুক্তার আহ্‌মেদ	৯২৭	২,৮০০
১৯।	রায়গঞ্জ (তপঃ)	কমরেড বিনয় মল্লিক	১,২৯৩	১,৪০৬
২০।	বালুরঘাট	সাগর মোদক	—	৩,০০২
মালদহ				
২১।	হরিশ্চন্দ্রপুর	কমরেড জয়ন্তী ঝা	৬৫৬	১,২৮৯
২২।	গাজল (তপঃ উপ)	কমরেড শিবানন্দ সরেন	২,২৩৩	৩,৬২৩
২৩।	কালিয়াচক	জন্মেজয় সরকার	—	৩,০৭৩
মুর্শিদাবাদ				
২৪।	ভগবানগোলা	কমরেড খায়রুল ইসলাম	২,৪৪৬	৩,১৫৫
২৫।	মুর্শিদাবাদ	কমরেড গুলশনারা ইভা	২,৬৩৭	৩,০৫৬
২৬।	নবগ্রাম	কমরেড বরুণ মণ্ডল	—	১,৬৩৮
২৭।	জঙ্গীপুর	কমরেড মিরজা নাসিরুদ্দিন	৩,৩৬৮	৩,৯৯৫
২৮।	সূতী	কমরেড সামিরুদ্দিন সেখ	২,৯০০	৩,৮৭৬
২৯।	ঔরাঙ্গাবাদ	কমরেড টিপু সুলতান	২,৬৩৭	২,২৪৮
৩০।	জলঙ্গী	কমরেড এহিয়া মণ্ডল	২,৫৩০	১,৭৭৫
৩১।	ডোমকল	কমরেড বাইজিত হোসেন	১,০৮৬	৩,৩৪৪
৩২।	নওদা	কমরেড হেলালুল ইসলাম	১,৬০৯	১,৫৫৭
৩৩।	হরিহরপাড়া	কমরেড বকুল খন্দকার	৭,৭৮৪	৮,০০৮
৩৪।	কান্দী	কমরেড নরেন্দ্রনারায়ণ রায়	১,৬০২	৮৯৩
৩৫।	বহরমপুর	কমরেড অপূর্ব ব্যানার্জী	—	২,৮৩৪
৩৬।	বেলডাঙা	কমরেড আবু বক্কর সিদ্দিকী	—	২,২৬৮
নদীয়া				
৩৭।	করিমপুর	কমরেড আজাদ রহমান	৪,১৪৭	৫,১৫৭
৩৮।	পলাশিপাড়া	কমরেড রফিকুল ইসলাম	২,৮১২	৪,২৪২
৩৯।	কৃষ্ণনগর (পশ্চিম)	কমরেড শৈলেন ঘোষ	—	২,৩৭২
৪০।	নাকাশিপাড়া	কমরেড আফতাবুদ্দিন	২,৫০৯	৩,০২৫
৪১।	কালিগঞ্জ	কমরেড খোদা বক্স	৩,৪৬৭	৬,৪১০
৪২।	রানাঘাট পূর্ব (তপঃ)	কমরেড জগদীশ মণ্ডল	৮৬৮	২,১৩৮
৪৩।	হরিণঘাটা	গোরাচাঁদ মণ্ডল (সমর্থিত)	—	৪,২১০
৪৪।	রানাঘাট (পশ্চিম)	কমরেড অজয় ভট্টাচার্য	—	১,৩৪০
৪৫।	চাকদা	কমরেড মিহির সিংহ	—	২,৪৫৮
উত্তর ২৪ পরগণা				
৪৬।	হাবড়া	কমরেড তুষার ঘোষ	৯২৭	৩,৫৮০
৪৭।	বসিরহাট	কমরেড অজয় বাইন	—	৩,০০৯
৪৮।	হাসনাবাদ	কমরেড কার্তিক সরকার	—	৮৪৫
৪৯।	স্বরূপনগর	কমরেড জয়ন্ত সাহা	১,৭০৪	২,২৫৩
৫০।	অশোকনগর	কমরেড তারক দাস	১,৬৪৫	২,৬৬৪
৫১।	গাইঘাটা	কমরেড গৌতম দাস	১,০২২	১,৬২১
৫২।	আমডাঙ্গা	সনৎ জানা (সমর্থিত)	—	২,৭৪৬
৫৩।	বীজপুর	কমরেড কালীপদ দেবনাথ	৪২৬	১,০২৭
৫৪।	ভাটপাড়া	কমরেড অমল সেন	—	(পরে ভোট হয়েছে, ফল পাওয়া যায়নি)
৫৫।	জগদ্দল	কমরেড কল্পনা বাগল	—	১,০৩৩
বীরভূম				
৫৬।	মুরারই	কমরেড নুরুল ইসলাম	২,৭৩৪	৩,৩৭৫
৫৭।	নলহাটি	কমরেড আবদুস সালাম	১,৩২১	২,৬৩৩
৫৮।	হাসন (তপঃ)	কমরেড অমল মণ্ডল	২,৮৪৮	৩,১৮০
৫৯।	রামপুরহাট	কমরেড আতাহার রহমান	—	১,২৮২
৬০।	ময়ূরেশ্বর (তপঃ)	কমরেড কল্যাণ মণ্ডল	—	২,২৯৮
৬১।	মহম্মদ বাজার	কমরেড কুদ্দুস আলি	২,১০৩	৪,০২৬
৬২।	সিউড়ি	কমরেড বাগাল মার্ডি	১,৭৯৬	১,৯৯৩
৬৩।	লাভপুর	কমরেড লালন কুমার দাস	—	২,০৩২
৬৪।	বোলপুর	কমরেড অরবিন্দ ঘোষ	—	১,০৩৫
কলকাতা				
৬৫।	রাসবিহারী	কমরেড শিবাজী দে	—	২,০২৯
৬৬।	কবিতীর্থ	কমরেড মমতাজ জাহেদ	৯৫৩	১,০৬৯
দক্ষিণ ২৪ পরগণা				
৬৭।	সাতগাছিয়া	কমরেড তাম্রধ্বজ আদক	১,৬৩৯	১,৭৩৭
৬৮।	কাকদ্বীপ	কমরেড অমিয় শাসমল	৮৩৪	২,০০৩
৬৯।	গোসাবা (তপঃ)	কমরেড নির্মল সরকার	১,৯২৩	৩,১৩৯
৭০।	সাগর	কমরেড প্রতিভা মিশ্র	৫৮৯	২,৮৯৪
৭১।	পাথরপ্রতিমা	কমরেড সুশান্ত দিন্দা	৩,৬১৫	৩,৮৬৪
৭২।	কুলপি	কমরেড জয়দেব জাতুয়া	১,২৪৪	২,১৫১
৭৩।	ক্যানিং পশ্চিম (তপঃ)	কমরেড বাদল সরদার	৮,২৪৬	৯,৭৭৬
৭৪।	মন্দিরবাজার (তপঃ)	কমরেড প্রহ্লাদ পুরকাইত	৩,৯৮৫	৪,১৬৩
৭৫।	মথুরাপুর (তপঃ)	কমরেড গুণসিন্ধু হালদার	৮,২২২	৪,৯৪৯
৭৬।	কুলতলি (তপঃ)	কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার	৬০,০২৯	৬৭,৬৬৪
৭৭।	জয়নগর	কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার	৪৯,৫৩৪	৫৯,৭৪৯
৭৮।	বারুইপুর	কমরেড সন্দীপন মহাপাত্র	—	২,৩১৩
৭৯।	মগরাহাট পশ্চিম	কমরেড মনিরুল ইসলাম	৮৪৬	১,৯২৪

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিপিএম, তৃণমূল, কংগ্রেসের মধ্যে কোনও নীতির লড়াই ছিলনা

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, এ রাজ্যে আপামর সাধারণ মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি কী, তবে সমস্যার আগুনে পুড়তে থাকা মানুষ মুহূর্ত সময় না নিয়ে বলবেন, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, লকআউট, বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধি, চিকিৎসায় ব্যয়বৃদ্ধি, ফসলের ন্যায্যদাম না পাওয়া, শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি না পাওয়া, বছরে বছরে খরা, বন্যা, নদী ও সমুদ্রের ভাঙন, উত্তরবঙ্গে চা বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, নারী পাচার, নারী ধর্ষণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রভৃতি হাজারও একটা সমস্যার কথা — যার ফলে জনজীবন জেরবার। এরপর যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয় এবারের বিধানসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক প্রচারে এর কোনও একটিও কি 'ইস্যু' হয়ে উঠেছিল? অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট দল জিতলে সেই সমস্যাটির সমাধান করা বা সমাধানের দাবিতে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করার কথাই কি প্রচারের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল? তবে, তার উত্তরও তিনি নিঃসন্দেহে দেবেন — না। দেখা গেছে, একমাত্র এস ইউ সি আই-ই প্রচারে এই ইস্যুগুলি তুলে এনেছিল এবং আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। এই কারণে এস ইউ সি আই-এর নির্বাচনী জনসভাগুলিতে উপচে পড়া ভিড় ছিল দেখবার মতো।

সকলেই জানেন, অন্যান্যবারের মত এবারের নির্বাচনেও প্রচার মাধ্যমগুলি ভোটদাতাদের সামনে দুটি পক্ষ দাঁড় করিয়েছিল। একদিকে সরকারপক্ষ, সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট; অপরদিকে বিরোধীপক্ষ, মূলত তৃণমূল, সাথে বিজেপি, কংগ্রেস। নীতিগতভাবে এই দুই পক্ষের অবস্থান কী? কংগ্রেস, এদেশে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর সবচাইতে বিশ্বস্ত দল, স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রে মোট প্রায় চল্লিশ বছর, এরাজ্যে কুড়ি বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা করে এসেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা তৃণমূলের সাথে সাম্প্রদায়িক বিজেপির জোটও কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা দখল করে কংগ্রেসের মতো একই কাজ করেছে — কংগ্রেসের সাথে যাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছাড়া নীতিগত কোন বিরোধ নেই। সিপিএম ফ্রন্টের নীতিগত অবস্থান হল, মুখে গরিব দরদের কথা, বিকল্প নীতির কথা বলে কংগ্রেসের বেসরকারীকরণ-উদারীকরণের নীতিকেই কার্যকরী করা, এবং সে কাজ তারা এত দক্ষতার সাথে করে চলেছে যে, এমনকী দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীও এ'রাজ্যের সরকারকে আদর্শ সরকারের স্বীকৃতি দিচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে 'ব্র্যান্ড' মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরছে। পুঁজিপতিদের পরিচালিত প্রচারমাধ্যমগুলি নির্বাচনের আগে থেকেই নিজেদের পছন্দের দল হিসাবে সিপিএমকেই তুলে ধরেছে। অর্থাৎ নির্বাচনী লড়াইয়ে মুখে যত বিরোধিতাই থাকুক না কেন বাস্তবে এই দলগুলির মধ্যে কোন নীতিগত বিরোধ নেই। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনী প্রচারেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সরকার পক্ষ বা বিরোধী কংগ্রেস-তৃণমূল কেউই বেশি কথা বলেনি। সকলেই কেবল উন্নয়নের রঙিন ফানুস উড়িয়েছে; ব্যক্তিগত কুৎসা, রেষারেষি, অপ্রাসঙ্গিক বিষয়, হালকা বিষয় এনে সমস্যাজর্জরিত মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, উন্নয়নের অলীক চিত্র, খুব বেশি হলে কোথায় রাস্তায় মাটি বা ইট পড়েছে কি পড়েনি, একটা নলকূপ হয়েছে কি হয়নি, অথবা একটা কালভার্ট বা ব্রিজের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে — যেগুলি আদৌ বিধানসভা নির্বাচনের বিষয় নয়, পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের সময়েই এগুলি আলোচনা হওয়ার কথা। কারণ রাস্তাঘাট, জল, আলো এগুলি ব্যবস্থা করার কাজ প্রধানত পঞ্চায়েত বা মিউনিসিপ্যালিটিরই। বিধানসভা হল রাজ্যের সামগ্রিক আর্থিক বা রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণের জায়গা। এক্ষেত্রে একটি সরকার কোন্ নীতিতে পরিচালিত হবে, তাতে মানুষের জীবনের বোঝা হালকা হবে, না কি ট্যাক্সবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির চাপে তা আরও দুঃসহ হয়ে উঠবে, মানুষ আন্দোলন করলে পুলিশ দিয়ে ঠেঙানো হবে কি না, সরকার বঞ্চিত-শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে না কি শিল্পায়ন আর উন্নয়নের বুলির আড়ালে শোষকশ্রেণীর পক্ষে থাকবে, পুলিশ নিরপেক্ষ থাকবে নাকি শাসক দলের নির্দেশে চলবে — এগুলিই বিধানসভায় নির্ধারিত হয়। তাই নির্বাচনী প্রচারেও সরকারের বিগত সময়ের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ হওয়ার কথা, অর্থাৎ সে নীতি সাধারণ মানুষের পক্ষে গেছে না বিপক্ষে গিয়ে দেশের মুষ্টিমেয় বড়লোক পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করেছে। বিপরীতে বিরোধী পক্ষে যারা থাকে তারা, সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির দ্বারা সাধারণ মানুষের ওপর নেমে আসা আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে একদিকে বিধানসভার অভ্যন্তরে অপরদিকে বিধানসভার বাইরে গণআন্দোলনের ময়দানে কী ভূমিকা পালন করেছে, নির্বাচনী বক্তব্য থেকে সাধারণ মানুষ তাই জানতে চায়। এগুলিই কি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পক্ষ বা বিরোধী পক্ষ, যাদের বক্তব্য খবরের কাগজগুলি ফলাও করে ছেপেছে, টিভি চ্যানেলগুলি দিবা-রাত্র দেখিয়েছে, তারা মানুষের সামনে উপস্থিত করেছিল? প্রধানমন্ত্রীর সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন বামফ্রন্টের ক্যাবিনেটকে ''চোরেদের ক্যাবিনেট'' বলে সততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নন্দনে গিয়ে ঢুকেছিলেন, কেন আবার সেই চোরদের দলে যোগ দিলেন, কেন এখন তিনি সালেম, টাটা, নেওটিয়ার চোখের মণি? মমতা ব্যানার্জী জ্যোতি বসু-চন্দন বসুর দুর্নীতি নিয়ে একসময় জনসভা মাত করলেও, দু'বার দিল্লীর মন্ত্রী হয়েও কেন তা উদঘাটন করলেন না — এসব প্রশ্ন এই সমস্ত নেতা-নেত্রীদের মতো রেডিও টিভি খবরের কাগজও সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে।

একটা সময় ছিল, যখন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে মানুষ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার আগ্রহ ভরে শুনত, তা থেকে নিজের মতামত স্থির করত, কোন্ নীতি সঠিক, কোন্ নীতি ভুল তা নির্ধারণ করত। অথচ, এবার আরও বেশি করে দেখা গেল, নাম-করা নেতা-মন্ত্রীদের নির্বাচনী সভাতেও রাজনৈতিক বক্তব্য নেই। ব্যতিক্রম একমাত্র এস ইউ সি আই-এর সভাগুলি, সেখানে সাধারণ কর্মীদের ছোট ছোট সভাতেও মানুষ ভিড় করে বক্তব্য শুনেছেন। সভা শেষ হওয়ার পরেও নানা প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিয়েছেন। কেন এই পার্থক্য? কেন বড় বড় দলগুলির বড় বড় নেতাদের বক্তব্যের তুলনায় এস ইউ সি আই-এর বক্তব্য শুনতে মানুষের বেশি আগ্রহ ছিল? কারণ এস ইউ সি আই-এর সভাগুলিতেই মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি, যেগুলিতে তারা প্রতিনিয়ত জেরবার হচ্ছে, সেগুলি উঠে এসেছে। যেখানে সরকার এবং তথাকথিত বিরোধীপক্ষের নেতারা ব্যক্তিগত কুৎসাতেই মত্ত থেকেছে, সরকার পক্ষের প্রথম সারির নেতা বিরোধী পক্ষের নেত্রী নির্বাচনে হেরে দরজায় খিল এঁটে থাকবেন, না মামার বাড়ি চলে যাবেন, তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিরোধী নেত্রী সরকারি দলের নেতাকে পাগল বলে অভিহিত করেছেন; মুখ্যমন্ত্রী মালদহে গিয়ে বিরোধী নেতা, যিনি বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মহাজোট গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁর অপূরিত কাজ পূরণ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার কথা গর্বভরে ঘোষণা করেছেন। আর এই সমস্ত বক্তব্য শুনেই দলীয় লোকজন হাততালি দিয়েছে। সেখানে এস ইউ সি আই-এর সভায় সরকার এবং বিরোধী দলের নীতির চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মালিকঘেঁষা নীতি অনুসরণের ফলে কীভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, ওষুধের দাম বাড়ছে, হাসপাতালের চার্জ বাড়ছে, শিক্ষায় ফি বাড়ছে, ডোনেশন চালু হচ্ছে — মানুষ এস ইউ সি আই-এর সভায় শুধু সেকথাই শোনেনি, সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে পার্টি কী লড়াই গড়ে তুলছে, তাতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা কী, কী কী দাবি আদায় হয়েছে — এসবও মানুষ শুনেছে। মালদহ-মুর্শিদাবাদে মানুষ নদী-ভাঙন রোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অমানবিক অবহেলার কথা শুনেছে, তার প্রতিরোধের দাবিতে আন্দোলনের কথা শুনেছে। উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি বেইমানির কথা শুনেছে, এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন তো নিজেদের চোখে দেখেছেন, একইভাবে বন্ধ চটকলের শ্রমিকরা সরকার এবং বিরোধীদলের বিশ্বাসঘাতকতার কথা এই পার্টির নেতাদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছেন। মানুষ বুঝেছে এদের রাজনীতি জনস্বার্থে লড়াইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে।

মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকার পক্ষের ছোটবড় সব নেতাদের মুখেই এবার যখন উন্নয়নের খই ফুটেছে, তখন এস ইউ সি আই দেখিয়েছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি আর উচ্চবিত্তদের উন্নয়ন হয়েছে, আর উন্নয়ন হয়েছে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী ও পুঁজিবাদের ধারকবাহকদের। মুখ্যমন্ত্রী তো রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের প্রতি ন্যূনতম দায়বদ্ধতাকেও ঝেড়ে ফেলে ঘোষণা করেছেন, পুঁজিবাদী উন্নয়নের পথেই তিনি হাঁটছেন। এই ঘোষণার উদ্দেশ্য যে আসলে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষারই প্রতিশ্রুতি, এস ইউ সি আই তা সাধারণ মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছে। প্রশ্ন তুলেছে, পুঁজিবাদের পথে দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন দূরে থাক সামান্যতম উন্নয়নও কি সম্ভব? কংগ্রেস পঞ্চাশ বছরে পুঁজিবাদী পথে জনজীবনের উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি, বিজেপি পারেনি, এখন বুর্জোয়াদের নয়া সেবক সিপিএম পুঁজিবাদী পথে উন্নয়ন ঘটিয়ে দেবে? সাধারণ মানুষ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় মিলিয়ে দেখেছে এই উন্নয়নের কোন প্রতিফলনই তাদের জীবনে নেই। বরং দেশ যতই এই উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, ততই তাদের জীবন-যন্ত্রণা বেড়ে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সমস্ত ফোলানো ফাঁপানো কথা সাধারণ মানুষের কোন আগ্রহই সৃষ্টি করতে পারেনি। বিপরীতে এস ইউ সি আই-এর সভাগুলি ছিল মানুষের জীবনের কথাতেই পূর্ণ, হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। তা শুধু নির্বাচনী লড়াইয়ে নয়, ছিল বাঁচার আন্দোলনের পথনির্দেশ।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রথম কর্ণাটক রাজ্য সম্মেলন

বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিকশ্রেণীর উপর যে সর্বাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে গত ১৫-১৬ এপ্রিল বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হল ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রথম কর্ণাটক রাজ্য সম্মেলন। ১৫ এপ্রিল সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। ১৬ এপ্রিল প্রতিনিধি সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বক্তব্য রাখেন। শ্রমিকশ্রেণীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণের সামনে যুক্ত আন্দোলনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি'র কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড নাগারাজ, টি ইউ সি সি'র রাজ্য সভাপতি কমরেড বি আর শিবশংকর। সি আই টি ইউ'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো হয়। প্রধান বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বলেন, গোটা দেশে রাজনৈতিক - সামাজিক-অর্থনৈতিক - সাংস্কৃতিক - শিক্ষা-নৈতিকতা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে এক গভীর সঙ্কটের মধ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে, লক্ষ লক্ষ কারখানা বন্ধ, ব্যাঙ্কে ১৩ লাখ কর্মচারী থেকে কমিয়ে ৪ লাখ করার ষড়যন্ত্র চলছে, রেলে ইতিমধ্যেই ২০ লাখ কর্মচারী থেকে কমিয়ে সাড়ে চৌদ্দ লাখে নামিয়ে আনা হয়েছে তথাকথিত উন্নয়নের নামে। কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে, হায়ার অ্যান্ড ফায়ার নীতির মাধ্যমে শ্রমিক শোষণ ও শ্রমিকের জীবনে অনিশ্চয়তা আরও তীব্রতর করা হয়েছে। যেখানেই শ্রমিকরা লড়ছে, সেখানেই পুলিশ-প্রশাসন, বিচারবিভাগ, সেনাবাহিনী নগ্ন আক্রমণ নামিয়ে আনছে। গুড়গাঁওয়ে হোন্ডা কারখানায় বীভৎস অত্যাচার আজও মানুষ ভোলেনি। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, এটা মুমূর্ষু পুঁজিবাদের শেষ মরণকামড়। তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস, বিজেপি সহ সকল বুর্জোয়া দল এবং সিপিএম, সিপিআই প্রভৃতি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক দল ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর নির্দেশিত পথেই চলছে। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত ক্ষেত্রগুলির শ্রমিকরাও অসংগঠিত শ্রমিকদের সঙ্গে একই ব্যানারের তলায় সমবেত হচ্ছে। প্রকাশ্য সভায় রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে সোমশেখরও বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধি অধিবেশনে সংগঠিত, অসংগঠিত, সরকারি বেসরকারি প্রভৃতি নানাক্ষেত্র থেকে ৩৫০ জন শ্রমিক কর্মচারী প্রতিনিধিত্ব করেন। কমরেড শঙ্কর সাহা বলেন, মার্কস বলেছিলেন, যে শ্রমিক দুনিয়াকে পাল্টাবে, আগে তাকে নিজেকে পাল্টাতে হবে। অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজকে পাল্টানোর সংগ্রামে শ্রমিককেও বুর্জোয়া সংস্কৃতি-নৈতিকতা-মানসিকতা থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রামে সচেতনভাবে লিপ্ত হতে হবে। এই সংগ্রামটি না করায় এদেশের অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনগুলি আজ বুর্জোয়াদের আক্রমণের সামনে শ্রমিকদের অসহায় অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। সম্মেলনে আন্দোলনের দাবি সনদ পেশ করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এস সিমাদ্রী। কমরেড কে রাধাকৃষ্ণকে সভাপতি কমরেড কে সোমশেখরকে সম্পাদক করে ১৩ জনের রাজ্য কমিটি এবং ৪৪ জনের রাজ্য কাউন্সিল গঠিত হয়।

বুথ দখল ছাড়া বাকি সব ধরনের রিগিংই সিপিএম করেছে

একের পাতার পর

পঞ্চমুখ হয়েছে। ভারতের বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এই আনন্দ ও অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে এ'কথাই পরিষ্কার হয়েছে যে, সিপিএম-এর অপশাসনে অতিষ্ঠ জনগণ এই সরকারের পরিবর্তন চাইলেও, বুর্জোয়াশ্রেণী চেয়েছিল সিপিএম-ফ্রন্টই আবার ক্ষমতায় ফিরুক। তৃণমূল-বিজেপি ও কংগ্রেস প্রত্যেকেই চিহ্নিত বুর্জোয়া দল হওয়া সত্ত্বেও, বুর্জোয়াশ্রেণীর সমর্থন না-পাওয়া এবং বামপন্থার বুলি আওড়ানো সিপিএম-এর পিছনেই বুর্জোয়াশ্রেণীর পূর্ণ সমর্থন ও মদত আবার প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে, দেশি-বিদেশি পুঁজির সেবায় সিপিএম কীভাবে চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলিকেও টেক্কা দিয়েছে।

এর কারণ বোঝাও দুঃসাধ্য নয়। বুর্জোয়াশ্রেণী অভিজ্ঞতায় দেখেছে, পুঁজিবাদের আক্রমণে জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভ ক্রমাগত তীব্র হচ্ছে, তাকে স্তিমিত করে মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে সিপিএম সবচেয়ে দক্ষ। যে বাংলাকে ব্রিটিশরা ভয় পেয়েছে, যে বাংলা স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গোটা ভারতবর্ষকে যে বাংলা চিরকাল পথ দেখিয়েছে, গত কয়েক বছরের শাসনে সেই বাংলাকে সিপিএম নির্বীর্য করে দিয়েছে। এ কাজ চিহ্নিত বুর্জোয়াশ্রেণীর দল কংগ্রেস, বিজেপি কখনই করতে পারত না। বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে, যতই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক না কেন, ভোটের ফলাফল যে শেষপর্যন্ত বুর্জোয়াশ্রেণীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে, সেকথাও এবারের ভোটের ফল আবার প্রকটভাবে প্রমাণ করে দিল। গভর্নমেন্ট 'বাই দি পিপল', 'অফ দি পিপল', 'ফর দি পিপল' — বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এককালের এই বাণী যে বাস্তবে 'বাই দি,অফ দি, ফর দি বুর্জোয়া'-তে পর্যবসিত হয়েছে — একথা এবারের ভোটের ফলাফলে আবারও স্পষ্ট হয়ে গেল। বুর্জোয়াশ্রেণীর ইচ্ছা ও ষড়যন্ত্রের কাছে অসংগঠিত জনগণের ইচ্ছা ভেসে গেল, বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যাওয়া ছাড়া জনগণের কিছুই করার রইল না।

জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাই এবার ভোটপর্ব শুরু হওয়ার আগে থেকেই মিডিয়ার প্রচারের মধ্য দিয়ে একেবারে নগ্ন হয়ে গিয়েছিল। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রকাশ্যে ঘোষণা করে নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এ ব্যাপারে তাদের প্রধান হাতিয়ার যে মাস্‌ল পাওয়ার, মানি পাওয়ার ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, সেই প্রকাশ্য মাস্‌ল পাওয়ারের জায়গাটা আর কোন রাখঢাক না রেখে এবার খোলাখুলি নিয়েছিল মিডিয়া পাওয়ার। সেজন্যই এবার ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই রাজ্যের প্রধান সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলি সরাসরি সিপিএমের পক্ষে প্রচারে নেমে একটানা বলতে থাকে, এবার সিপিএম জিতছে। পাঁচ দফায় ভোট হওয়ায় এই প্রচারে সিপিএম-এর আরও সুবিধা হয়ে যায়। প্রতিটি পর্বের ভোট শেষের পরই মিডিয়া প্রচার করেছে, কোন্ জেলায় সিপিএম কত বেশি আসন পাচ্ছে। ক্রমান্বয়ে একের পর এক পরবর্তী পর্যায়ের ভোটগুলিতে একটানা এই প্রচারের প্রভাব বিচ্ছিন্ন অসংগঠিত জনমতের উপর পড়তে বাধ্য। এই প্রচারের দ্বারা এই বার্তাই ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, এবারের ভোটে জনগণ যতই পরিবর্তন চাক না কেন, ক্ষমতায় সিপিএম-ই ফের আসছে। সিপিএম নেতারাও নির্বাচন কমিশন ও পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে নকল লড়াইয়ের মহড়া দিয়ে বলতে থাকেন, 'ভোটের পর পর্যবেক্ষকরা চলে যাবে, আমরা থাকব'। এই কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে হুমকি আছে তার রূপ যে কী ভয়ঙ্কর সেটা গ্রামবাংলার মানুষ জানে। সিপিএম-এর কোপে পড়লে ঘরবাড়ি জ্বলবে, জমি হাতছাড়া হবে, সর্বস্ব খোয়াতে হবে, ইজ্জত-সম্ভ্রম যাবে, বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এটাই গ্রামবাংলার মানুষের অভিজ্ঞতা। এই অবস্থায় গ্রামবাংলার জনগণকে বলভরসা দেওয়ার মত উপযুক্ত সাংগঠনিক ক্ষমতা, প্রস্তুতি ও মানসিকতা তৃণমূল বা কংগ্রেস কারোরই ছিল না। মিডিয়ায় বুর্জোয়াশ্রেণীস্বার্থ অনুযায়ীই নির্বাচনে তৃণমূল ও কংগ্রেসকেই একমাত্র বিরোধী দল হিসাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ পাশে এদের পায়নি, দুই দলের নেতারাই তখন শুধু বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। ভোটের ফলকে গ্রহণীয় করতে মিডিয়া প্রচার করছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উন্নয়ন কর্মসূচির জন্যই নাকি এই জয়। এই উন্নয়ন বলতে তো কিছু ফ্লাইওভার, আবাসন, পার্ক ও হোটেল। তা এসব যা কিছু সে তো কলকাতা শহরকে ঘিরেই হয়েছে, তৎসত্ত্বেও কলকাতায় বেশিরভাগ আসনে সি পি এম হারল কেন ?

দ্বিতীয়ত, এবার প্রচারে প্রোপাগান্ডায় বিরাট টাকার খেলা ছাড়াও বিপুল পরিমাণে টাকা প্রকাশ্যে দেখা না গেলেও, তলে তলে ভোট কেনার কাজে ছড়ানো হয়েছে। প্রতীক ছাপানো গেঞ্জি-অ্যাপ্রন-টুপিতে, অটো-বাস-রিক্সার পোস্টারে সিপিএম-এর সাথে তৃণমূল বা কংগ্রেস কেউই পাল্লা দিতে পারেনি। আজকের বাজারদর অনুযায়ী এর পিছনে খরচের হিসাব করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এছাড়া গ্রাম, পাড়া, ক্লাব ইত্যাদিকে টাকার জোরে কিনে নিয়েছে সিপিএম। পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, থ্রেট ও নগদ টাকার জোরে বেকার যুবকদের সিপিএম-এর হয়ে নামানো হয়েছে। এজন্য কোটি কোটি টাকা জুগিয়েছে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরা। বুর্জোয়াদের পছন্দসই বিরোধী দল হিসাবে তৃণমূল, বিজেপি এবং কংগ্রেসও পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্য পেয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু এ'রাজ্যে সিপিএম পেয়েছে সবথেকে বেশি।

তৃতীয়ত, বুর্জোয়াশ্রেণীর চাহিদা মতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার বা প্রশাসনিক ক্ষমতাও সিপিএম-এর পক্ষেই কাজ করেছে। তাকে এতটুকু বদলাতে পারেনি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি। ভোটার লিস্ট তৈরি ও সংশোধন থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করেছেন এ'রাজ্যেরই সরকারি, মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েত কর্মচারীরা, যাদের উপর সিপিএম-এর নিয়ন্ত্রণ অজানা নয়। ভোটের মাস দুই আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা এ'রাজ্যে এসে ঘোষণা করেন, ভোটার তালিকায় অসংখ্য মৃত ও ভুয়া ভোটারের নাম রয়েছে, যা বাদ দিতে হবে এবং ভোট দিতে হলে সকল ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্র থাকতেই হবে। এই সময় উত্তর ২৪ পরগণায় এক সিপিএম নেতার ডেরা থেকে জাল সচিত্র পরিচয়পত্র (এপিক) ছাপার মেশিন পর্যন্ত ধরা পড়ে। দু'এক দিন হৈচৈ-এর পর সব চাপা পড়ে যায়। একথাও প্রকাশ পায় যে, ভোটার লিস্ট থেকে লক্ষ লক্ষ ভুয়া ও মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়া, নতুন ভোটারের নাম নথিভুক্ত করা ও তাদের জন্য এপিক ইস্যু করে ত্রুটিহীন ভোটার তালিকা তৈরি করতে বেশ কয়েকমাস সময় প্রয়োজন। অথচ, প্রয়োজনীয় সেই সময় না দিয়েই পূর্বঘোষিত সময় অনুযায়ী ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকায় সংশোধন যা করা হল, তাতে দেখা গেল, পুরনো তালিকা থেকে যত লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তার থেকেও বেশি সংখ্যায় নতুন ভোটার যুক্ত করা হয়েছে। কে করেছে ? যে সরকারের বিরুদ্ধে ভোটার তালিকা নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ, সেই সরকারের নিযুক্ত ব্যক্তিরা। শুধু তাই নয়, এবার নিয়ম করা হল, মনোনয়নপত্র পেশের শেষ দিন পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে, তালিকা সংশোধনও চলবে। একেবারে শেষ সময়ে ঘোষণা করা হল, চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ২৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নতুন ভোটার যুক্ত হওয়া, আবার লক্ষ লক্ষ বাতিল হয়ে যাওয়া — এই যোগ-বিয়োগে ভোটার লিস্ট, যেটাই ভোটের অঙ্কের হিসেব-নিকেশের মূল ভিত্তি, তার পাল্লা কোন্ পক্ষে ঝুঁকল বা ঝোঁকানো হল, তা জানার আর উপায় থাকল না। শেষবেলায় ২৫ লক্ষ নাম বাতিল নিয়ে সিপিএম নেতারা হৈচৈ শুরু করলেন, যেন এর দ্বারা তাদের ক্ষতি হয়ে গেছে। আসলে এসবই ছিল নাটক। ভোটের দিন তাই দেখা গেল, বিভিন্ন কেন্দ্রে ধরে ধরে সিপিএম বিরোধী ভোটারদের নামগুলি তালিকা থেকে উধাও হয়ে গেছে, যেটা সেই ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে জেনেছেন।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সচিত্র পরিচয়পত্রের কারসাজি। নির্বাচন কমিশন প্রথমে ঘোষণা করেছিল, সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়া এবার কেউ ভোট দিতে পারবে না। কিন্তু শেষ দিকে এসে যখন সকল ভোটারের ছবি তোলা হল না, তখন কমিশন বলল, যারা 'এপিক' পায়নি, তারা পরিচয়ের অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখিয়েও ভোট দিতে পারবে, তবে সেজন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের স্লিপ নিতে হবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে এইভাবে যত স্লিপ ইস্যু করা হয়েছে, সেগুলি বেশিরভাগ কারা করিয়েছে এবং ভুয়া ভোটের ক্ষেত্রে তা কত অংশে অবদান রেখেছে, তার হিসেব বাইরের কেউ জানেনা। অতীতে দেখা গেছে, প্রভাব খাটিয়ে প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে আগে থেকেই গোছা গোছা স্লিপ নিয়ে নির্ধারিত সময়ের পরে সেই স্লিপ দিয়ে সিপিএম-এর পক্ষ থেকে ক্রমাগত লোক পাঠিয়ে অধিক রাত পর্যন্ত ভোট করানো হয়েছে। অন্যদিকে বুথে বুথে ভোটারদের 'এপিক' চেক করার কাজটি যে পোলিং স্টাফদের দিয়ে করানো হয়েছে, তারা কিন্তু রাজ্য সরকারের দ্বারাই নিযুক্ত। সুতরাং এবার নির্বাচন কমিশন 'নির্ভুল ভোটার তালিকার ভিত্তিতে' নির্বাচন করার যে ঘোষণা করেছিল, বাস্তবে সেটা হয়নি, অসংখ্য ভুল ও ইচ্ছাকৃত ফাঁকফোকর থাকার ফলে তা সিপিএম-এর জন্য কারচুপি করার রাস্তা খুলেই রেখেছিল, যার সুযোগ নিতে সিপিএম অবশ্যই পিছিয়ে থাকেনি। এবং স্থানীয়ভাবে ভোটার তালিকায় এবারকার গোঁজামিল নিয়ে বুর্জোয়া মিডিয়া একবারও প্রশ্ন তোলেনি। এর ফলে, ভোটার তালিকা নিয়ে ভোটের আগেই জনমনে যে সংশয় দেখা দিত, তা এবার দেখা দেয়নি। এবং এ'রকম ধারণাই তৈরি করা হয়েছিল যে, এবার যেন ভোটার তালিকার জালিয়াতি রুখে দেওয়া গেছে, বাস্তবে যেটা সত্য নয়।

ভোটে রিগিং সম্পর্কে জনমনে একটা ভুল ধারণা আছে। অনেকেই মনে করেন, বুথ দখল করে ব্যালট পেপারে ছাপ্পা দিতে বা ভোটযন্ত্রে জোর করে বোতাম টিপতে না পারলে রিগিং করা যায় না। তাই যদি হয়, তাহলে মিডিয়ার প্রচার, গ্রামে-শহরে সিপিএম-এর চাপা হুমকি, ভোটার তালিকায় জল, এপিক নিয়ে কারসাজি — এগুলিকে কী বলা হবে ? এগুলি কি রিগিং নয় ? অনেকে আবার মনে করেন, ইলেকট্রনিক ভোটযন্ত্রে কারচুপি করা যায় না। এই ধারণাও ভুল। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন ও আপত্তি উঠেছে বলেই পশ্চিমের উন্নত প্রযুক্তির অনেক দেশেও এই ভোটিং মেশিন ব্যবহার না করে এখনও পুরনো ব্যালট পেপার পদ্ধতি চালু রাখা হয়েছে। ২০০০ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিগিং-এর যে অভিযোগ উঠেছিল, পরে জানা গেছে যে, ভোটিং মেশিনে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ে কারসাজি করেই তা করা হয়েছিল। যে বিশেষজ্ঞ এটি করেন, তিনি নিজেই ২০০৪ সালে হাউস জুডিসিয়ারি কমিটির কাছে হলফনামা দিয়ে সেকথা কবুল করেছেন। এবার পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর বিরুদ্ধে প্রবল গণরোষ থাকা সত্ত্বেও এবং জনগণ পরিবর্তন চাওয়া সত্ত্বেও সিপিএম-এর এই রহস্যজনক বিপুল জয়ের পিছনে অন্যান্য উপায়ের সাথে ভোটযন্ত্র ভূমিকা পালন করেছে কিনা, এই প্রশ্ন অমূলক নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে, একমাত্র প্রকাশ্যে সন্ত্রাস এবং বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট দেওয়া ছাড়া বাকী সমস্ত ধরনের কারচুপি এবং অর্থ ও ভয় দেখিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা সহ সমস্ত কিছুই এবারের নির্বাচনে আগের মতই কাজ করেছে এবং নির্বাচন কমিশনের উপস্থিতিতেই করেছে। অথচ নির্বাচন কমিশন এবং বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে রিগিং মুক্ত নির্বাচনে জনগণের প্রকৃত রায়ে সিপিএম জিতেছে, একথা বিশ্বাস করানোর সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা হচ্ছে। বুর্জোয়াদের পরিকল্পনা অনুযায়ীই এবারের নির্বাচনে সিপিএম-এর বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার এই কাজটি কেন্দ্র-রাজ্যের বোঝাপড়ায় নির্বাচন কমিশন করে গেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের পছন্দসই একটি দল বা জোটকে যেমন সরকারে বসায়, তেমনই তাদেরই স্বার্থরক্ষাকারী অপর একটি দল বা জোটকে বিরোধী পক্ষে বসায়, প্রয়োজনে বুর্জোয়ারা এই দুই দল বা জোটের মধ্যে পাল্টাপাল্টি করে কখনও অপোজিশনে রাখা দলকে সরকারে নিয়ে আসে এবং সরকারি দলকে অপোজিশনে নিয়ে যায়, কখনও বিপরীতটা করে। এই দিক থেকে এবার এ'রাজ্যের নির্বাচনে বুর্জোয়া মিডিয়া সিপিএম-এর বিরোধীপক্ষ হিসাবে তৃণমূল ও কংগ্রেসকেই তুলে ধরেছে এবং এরা বুর্জোয়া দল হিসাবে যে ভূমিকা পালন করেছে, সেটাও বুর্জোয়াশ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা মতই। তৃণমূল ও কংগ্রেস উভয়ের নেতা-নেত্রীরাই জানতেন যে, ভোটে তাদের দুই দল একজোট না হলে সিপিএম-এরই সুবিধা হবে, তবুও তৃণমূল বিজেপি'র সঙ্গ ছাড়েনি, অপরদিকে কংগ্রেস দিল্লিতে গাঁটছড়া বেঁধে রেখেছে সিপিএম-এর সঙ্গে। ভোটের লড়াইয়েও এদের মধ্যে কোন্ দল পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-এর পরে দ্বিতীয় স্থান পাবে, তা নিয়েই এই দুই দল নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করেছে। জনগণ যেহেতু সিপিএম-এর পরাজয় চেয়েছিল, তাই মহাজোট গঠনের ঘোষণায় জনমনে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। নেতা-নেত্রীরা শেষ মুহূর্তে মহাজোটের প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দেন, জনগণ হতোদ্যম হয়ে যায়। বুর্জোয়াশ্রেণীও চায়নি মহাজোট হয়ে সিপিএম অসুবিধায় পড়ুক। ফলে এর পিছনে তাদের ভূমিকা থাকাটাও স্বাভাবিক। এত কিছু সত্ত্বেও সিপিএম ৮০টিরও বেশি আসনে জিততে পেরেছে কংগ্রেস ও তৃণমূলের ভোট কাটাকাটির ফলে। জোট হলে শুধু এই ৮০টিতেই নয়, একথা নিশ্চিত যে আরও বহু আসনেই সিপিএম পরাস্ত হত। সিপিএম-এর অপশাসনে অতিষ্ঠ জনগণ যেখানে পরিবর্তন চেয়েছে, সেখানে এই দুটি দল জোট না গড়ে ও নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে জনগণের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ফলে তৃণমূল বা কংগ্রেসকে দিয়ে সিপিএম-কে পরাস্ত করা যাবে না। যদিও একথা সত্য যে, এই তৃণমূল ও কংগ্রেস যদি একজোট হয়ে সিপিএম-কে পরাস্ত করে সরকারে বসতেও পারত তার দ্বারা জনগণের দুর্দশা বাড়ত বই কমত না।

গত ত্রিশ বছরে সিপিএম শাসনের ইতিহাস দেখাচ্ছে, তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেস এই দক্ষিণপন্থী দলগুলি যতই নিজেদের সিপিএম-এর বিকল্প বলে জাহির করুক, বাস্তবে এরা কি ভোটের ক্ষেত্রে, কি জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনক্ষেত্রেই সিপিএম-এর বিকল্প হতে পারেনি। কখনই যথার্থ বিরোধী দলের ভূমিকা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভদোদরায় বিজেপির সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ

ইউপিএ'র ভূমিকায় নগ্ন হল কপট ধর্মনিরপেক্ষতা

১ মে গুজরাট আবার রক্তাক্ত হল। সংখ্যালঘু মানুষের রক্তে লাল হল ভদোদরা শহর। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, পুলিশের গুলি চালনায় ও উন্মত্ত জনতার অগ্নিসংযোগে ৬ জন মারা গেছে। জখম হয়েছে বহু। তেলকল, বেকারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, লুঠতরাজ চলেছে, পুলিশের সাহায্য চেয়ে সংখ্যালঘুরা সাহায্য পায়নি, তাদের বলা হয়েছে — 'পাকিস্তান পুলিশের কাছে যা'। পুলিশ প্রশাসনে সাম্প্রদায়িকতা কী ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এই ঘটনাই তা দেখিয়ে দেয়। নরেন্দ্র মোদির পুলিশ মাথায় টুপি দেখতে পেয়েই জিপ থেকে গুলি করেছে। গুজরাটের বিজেপি সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান দূরে থাক সংহারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ২০০২-এর দু'মাসব্যাপী পরিকল্পিত সংখ্যালঘু নিধনযজ্ঞ যা উৎকটরূপে দেখিয়ে গেছে, এবারও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল।

ঘটনার সূত্রপাত রাস্তা সম্প্রসারণ নিয়ে। রাস্তা সম্প্রসারণের নামে দুশো বছরের পুরনো ঐতিহাসিক একটি দরগা আমলাতান্ত্রিক কায়দায় ভেঙে দেওয়াকে কেন্দ্র করে এই রক্তাক্ত ঘটনা ঘটেছে। রাস্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যদি মন্দির-মসজিদ-দরগা-গুরুদুয়ার সরাতেই হয় তাহলে প্রশাসনকে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, সরানোর সার্বিক প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তবেই তা করণীয়। সংবাদে প্রকাশ, ভদোদরার সুফিদের দরগাটির ক্ষেত্রে অনুরূপ আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য মীমাংসাসূত্রও নির্ধারিত হয়। কিন্তু পুরকর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী দরগাটির অংশবিশেষ না ভেঙে গোটা দরগাটিই বিপুল পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে গুঁড়িয়ে দেয় এবং রাতারাতি ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে রাস্তা পর্যন্ত বানিয়ে ফেলে। ঠিক যেমনটা তারা করেছিল ২০০২ সালে। তাহলে দোষটা কার? ভদোদরার মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা মীমাংসাসূত্রে এসে যে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন, মোদি প্রশাসন তার প্রতি চূড়ান্ত অমর্যাদা প্রদর্শন করেছে। শুধু তাই নয়, গুজরাট হাইকোর্ট একই সঙ্গে ১২০০ মন্দির সরিয়ে দেওয়ার যে রায় দিয়েছে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে মোদি প্রশাসন কোন তৎপরতা দেখায়নি। বিজেপি সরকারের এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই গুজরাট আবার রক্তাক্ত হল।

এই ভেদবুদ্ধির পেছনে ধর্মবিশ্বাস নেই, আছে জনসমর্থন হারানো বিজেপি দলের ক্ষমতা দখলের কুৎসিত রাজনীতি — এটা মুসলিম ধর্মাবলম্বী এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী উভয় অংশের মানুষকে বুঝতে হবে। আগামী বছর গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই বিজেপি'র দাঙ্গার অপচেষ্টা। অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির মতোই বিজেপির শাসনেও সাধারণ মানুষের জীবন তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে জেরবার। ২০০২ সালে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে হিন্দু ভাবাবেগ তুলে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতায় এলেও হিন্দুধর্মের গরিব মেহনতি মানুষের প্রশ্ন — তাদের জীবনের দুর্দশা কমেনি কেন? হিন্দু ধর্মাবলম্বী শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এ প্রশ্ন না উঠে পারে না যে তারা কি বারবার বিজেপির হাতে দাঙ্গার তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহৃত হবে? বিগত ৫ বছরে কেন্দ্রে বিজেপির চূড়ান্ত জনবিরোধী শাসনের পরিণামে কেন্দ্রীয় সরকারে তাদের পরাজয়, বিজেপি নেতাদের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন এবং সম্প্রতি উমা ভারতীর নেতৃত্বে বিজেপি দলের ভাঙন দলের মধ্যে তীব্র হতাশা সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থায় দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করতে, ধর্মীয় উন্মত্ততার মাদকতায় চাগিয়ে তুলতে বিজেপি নেতারা ক্রিমিনালদের মতো ঐ রক্তাক্ত কাণ্ড ঘটিয়েছে।

ভদোদরায় সংখ্যালঘুদের উপর এহেন বর্বরোচিত আক্রমণের হোতাদের এবং সংশ্লিষ্ট দুষ্কৃতীদের শাস্তিবিধানের অবশ্যকরণীয় কাজ সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়ার ঘটনা তাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ভড়ং উন্মোচন করে দিয়ে গেল। ইউ পি এ সরকার সঙ্কট মোকাবিলা তথা বিজেপির উপর চাপ সৃষ্টির জন্য সেনা পাঠালেও এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ জয়সওয়ালের নেতৃত্বে পরিদর্শন টিম পাঠালেও এবং ঘটনাস্থল ঘুরে এসে জয়সওয়াল তাঁর রিপোর্টে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করলেও সংবাদে প্রকাশ 'আগামী বছরের বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে কড়া কোন ব্যবস্থা নেওয়া বাস্তবসম্মত হবে বলে মনে করছে না মনমোহন সিংয়ের সরকার'। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ইউ পি এ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতা কত কপট। দুষ্কৃতীদের শাস্তি দিলে পাছে হিন্দুভোট বিজেপির দিকে চলে যায় এই হিসাব কষেই ইউ পি এ সরকারের 'লাঠি ভাঙবে না সাপও মরবে না' নীতি অবলম্বন। এর দ্বারা আর যাই হোক, কংগ্রেস সিপিএম প্রভৃতি ইউ পি এ গোষ্ঠীভুক্ত দলগুলি সংঘালঘুদের নিরাপত্তার গ্যারান্টার — একথা বোঝায় না।

জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে কি ?

পাঁচের পাতার পর

পালন করতে পারেনি। জনগণকে বুঝতে হবে যে, সিপিএম-এর মতোই তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেস বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ রক্ষারই দল। ফলে জনস্বার্থে এরা কখনই সিপিএম-এর যথার্থ বিকল্প হতে পারে না। সেজন্য জনগণকে প্রকৃত সংগ্রামী বিকল্প খুঁজে নিতে হবে।

এবারের নির্বাচনে আমাদের দল এস ইউ সি আই একক শক্তিতে ১২৭টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। অথচ গোটা নির্বাচনপর্বে মিডিয়ার প্রচারে এস ইউ সি আই-এর অস্তিত্বই ছিল না। এটাই স্বাভাবিক, কারণ এস ইউ সি আই হচ্ছে একমাত্র দল যারা গত ত্রিশ বছর ধরে সিপিএম-এর অপশাসনের বিরুদ্ধে যথার্থ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই দলের নেতা-কর্মীরাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা হাতিয়ার করে জনগণের বাঁচার দাবিতে প্রাণ দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে, কারাবরণ করে, মিথ্যা মামলার শিকার হয়ে একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। জনমনে এই দলের প্রভাব ও সমর্থনও বাড়ছে, যা এবার ভোটের ফলেও দেখা গেল। এজন্যই সিপিএম নেতারা ঘোষণা করেছিলেন, গণআন্দোলনের দুই ঘাঁটি জয়নগর ও কুলতলি থেকে এস ইউ সি আই-কে উৎখাত করবেন। কিন্তু এই দুই কেন্দ্রের গরিব-মধ্যবিত্ত জনগণ ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে পুনরায় এস ইউ সি আই-কে জয়ী করেছে। অন্যান্য প্রায় সকল আসনেই এস ইউ সি আই-এর ভোটের পরিমাণ এবার বেড়েছে, অর্থাৎ জনগণ বেশি সংখ্যায় ভোট দিয়েছেন। রাজ্যের জনগণের এই ক্রমবর্ধমান আস্থা ও বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার শপথ ঘোষণা করছি।

সব আসনেই এস ইউ সি আই-এর ভোট বেড়েছে

তিনের পাতার পর

জেলা	কেন্দ্র	প্রার্থী	প্রাপ্ত ভোট ২০০১	২০০৬
মেদিনীপুর				
৮০।	তমলুক	কমরেড তপন ভৌমিক	৩,১৮২	৫,৯৯৬
৮১।	পাঁশকুড়া পূর্ব	কমরেড অনুরূপা দাস	২,৩২৪	৩,৪৫৯
৮২।	পাঁশকুড়া পশ্চিম	কমরেড আবদুল মাসুদ	—	২,৯৬০
৮৩।	ময়না	কমরেড নকুল জানা	২,২৪২	২,৪৪৪
৮৪।	ভগবানপুর	কমরেড নারায়ণ দাস	২,০৮২	১,৫৪৭
৮৫।	এগরা	কমরেড জগদীশ সাউ	—	২,৯২১
৮৬।	কাঁথি দক্ষিণ	কমরেড চিত্তরঞ্জন জানা	২,০৯১	১,৭৫৮
৮৭।	নারায়ণগড়	কমরেড সূর্য প্রধান	৩,৮২৮	৮,১৯৬
৮৮।	মেদিনীপুর	কমরেড প্রাণতোষ মাইতি	১,১৮৫	৪,৩০১
৮৯।	বিনপুর (তপঃ উপ)	কমরেড সুশীল মাণ্ডি	২,৩০৮	৪,২১৯
৯০।	ঝাড়গ্রাম	কমরেড অরুণ দাস	১,৮৭৯	৬,৬৮৩
৯১।	শালবনী	কমরেড কালিপদ মাহাত	—	১,৮৪৭
৯২।	কেশিয়ারী (তপঃ উপ)	কমরেড শ্যামসুন্দর সিং	—	৪,৬১৬
৯৩।	সবং	কমরেড জগন্নাথ দাস	১,১৪০	২,৫০৩
৯৪।	নন্দীগ্রাম	কমরেড ভবানী দাস	—	২,১৬৭
৯৫।	খড়্গপুর টাউন	কমরেড ডি জগন্নাথ (কিট্টু)	—	১,৭৯৫
হাওড়া				
৯৬।	শ্যামপুর	কমরেড প্রদীপ মণ্ডল	৮৬৭	১,৯৬২
৯৭।	বাগনান	কমরেড চণ্ডী মাইতি	১,২২৬	১,১৬৪
৯৮।	শিবপুর	কমরেড সৌমিত্র সেনগুপ্ত	—	১,৭৫৮
৯৯।	বালি	কমরেড কাজল মিত্র	—	৭৩২
বাঁকুড়া				
১০০।	ছাতনা	কমরেড জাপানি পরামানিক	২,৬৬৪	৫,৩২৬
১০১।	বাঁকুড়া	কমরেড লক্ষ্মী সরকার	৩,৩৭৩	৪,৯১৪
১০২।	ওন্দা	কমরেড জয়দেব কর	২,৮৭২	৬,০৭২
১০৩।	বিষ্ণুপুর (পশ্চিম)	কমরেড শশীভূষণ ব্যানার্জী	২,৪৯৫	৫,৪৭৫
১০৪।	ইন্দপুর (তপঃ)	কমরেড সদানন্দ মণ্ডল	৩,৭৮৯	৫,১৩২
১০৫।	রাণীবাঁধ (তপঃ উপ)	কমরেড রামকৃষ্ণ মুদী	—	৩,৬০৮
১০৬।	তালডাংরা	কমরেড কবিতা সিংহ বাবু	—	৪,২৩৮
পুরুলিয়া				
১০৭।	রঘুনাথপুর (তপঃ)	কমরেড অনিল বাউড়ী	৫,৫৯৫	৭,৬৬৫
১০৮।	পাড়া (তপঃ)	কমরেড মথুর বাউড়ী	৪,৪৫৮	৭,১৩৫
১০৯।	কাশীপুর (তপঃ উপ)	কমরেড অনিল বাস্কে	২,২৫০	৪,১১৩
১১০।	হুড়া	কমরেড সীতারাম মাহাত	২,১৮৩	৩,৯৫৯
১১১।	আড়ষা (তপঃ উপ)	কমরেড গোপাল সিং বাবু	১,৫১৮	১,৪৬৮
১১২।	ঝালদা	কমরেড সুফল কুমার	—	১,৯০১
১১৩।	জয়পুর	কমরেড দুর্গা মাহাত	—	৫৮০
১১৪।	মানবাজার	কমরেড অজিত মণ্ডল	—	৩,২৫৬
১১৫।	পুরুলিয়া শহর	কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য	২,২৩৩	৪,১১১
বর্ধমান				
১১৬।	বারাবণী	কমরেড প্রবীর চ্যাটার্জী	—	৩,৫৪৮
১১৭।	দুর্গাপুর - ১	কমরেড প্রভাতী গোস্বামী	২,৮৬৮	৩,১০২
১১৮।	দুর্গাপুর - ২	কমরেড যুগল পাখিরা	৩,২৭৯	৪,৩১৫
১১৯।	কাটোয়া	কমরেড অপূর্ব চক্রবর্তী	—	৪,৪৪০
১২০।	আউষগ্রাম	কমরেড মনসা মেটে	—	১,৭৪১
১২১।	কুলটি	কমরেড চিত্তরঞ্জন দাস	১,০৯১	১,২৪৯
১২২।	মঙ্গলকোট	কমরেড মোকলেসুর রহমান	১,৭৫৬	৫,১৭৭
হুগলি				
১২৩।	হরিপাল	কমরেড প্রদীপ সিংহ	১,৯৬৪	২,৩৬৪
১২৪।	চাঁপদানি	কমরেড পঞ্চানন খাঁ	—	৩,৯৩৪
১২৫।	শ্রীরামপুর	কমরেড সুরজিৎ দেবরায়	১,৫৮৩	২,২৩৬
১২৬।	পোলবা	কমরেড প্রদ্যোৎ চৌধুরী	—	২,৪৯৪
১২৭।	বাঁশবেড়িয়া	কমরেড মণিভূষণ ঘোষ	—	২,৯৪২
			২,৯৮,৫৮২	৫,১৪,০০১

এস ইউ সি আই-এর প্রতি এই বর্ধিত জনসমর্থন গণআন্দোলনকে শক্তিশালী হতেই সাহায্য করবে।

অপুষ্টিতে শিশুমৃত্যু

‘ধনী’ ভারতবর্ষ আফ্রিকার স্তরে নেমেছে

জিডিপি’র হারের নিরিখে বিশ্বে ভারতবর্ষের স্থান দ্বিতীয়, চীনের ঠিক পরেই; ভারতের এহেন উন্নয়নের বাদ্যি বাজছে বিশ্বজুড়ে। চাঁদে মানুষ পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে ভারতবর্ষ। আমেরিকা, ফ্রান্স, ব্রিটেনের মালিকশ্রেণী ও সরকার তার কাছে ছুটে আসছে নাকি বন্ধুত্ব করতে। সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হচ্ছে, ভারতবর্ষে ‘বিলিওনিয়ার’ অর্থাৎ কমপক্ষে ১০০ কোটি ডলার অর্থের যারা মালিক তাদের সংখ্যা ১২ জন। এইসব ভারতীয় ধনপতিদের মোট সম্পদের হিসেবে ভারতবর্ষের স্থান বিশ্বে ত্রয়োদশ। সংবাদে আরও প্রকাশিত হচ্ছে, এদেশের কোন্ পুঁজিপতি সম্পদের দৌড়ে কাকে হারাতে চলেছেন, কোন্ কোম্পানি প্রতি বছর কত বেশি হারে মুনাফা করছে ইত্যাদি। এগুলির মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ‘ধনী’ চেহারাটির প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চলছে। বাস্তবে এই চোখ ধাঁধানো জৌলুস ও কান ভরানো প্রচারের আড়ালে চাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছে অনাহারী ভারতবাসীর কঙ্কালসার চেহারা। মুষ্টিমেয় ভারতীয় অধিক ভোজনজনিত মেদ ঝরাতে জিমে যাচ্ছে, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ শিশু খালি পেটে স্কুলে যাচ্ছে, ক্লাসে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছে খিদেয়।

ভয়াবহ সেই চিত্র রাষ্ট্রসংঘের ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেন্স ফাণ্ডের (ইউনিসেফ-এর) চলতি ২০০৬ সালের সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, শিশুদের অপুষ্টির প্রশ্নে ভারতবর্ষ নেমে গেছে আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়া রাষ্ট্রের স্তরে। ভারতের প্রায় ৫ কোটি ৭০ লক্ষ শিশু অপুষ্টির শিকার, খাদ্য তাদের জোটে না। এই অপুষ্টির কারণেই এদেশে প্রায় ২১ লক্ষ শিশু প্রতি বছর মারা যাচ্ছে। কিন্তু কেন শিশুদের এই অপুষ্টি?

ঐ সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়েছে, এদেশে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন মহিলার শরীরের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় কম; ফলে, তারা যে শিশুদের জন্ম দিচ্ছে তারাও কম ওজনের। নিরাপদ শৌচব্যবস্থা, সুষম খাদ্য ও শিক্ষার অভাব এবং সেই সঙ্গে মহিলাদের সামাজিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মহিলাদের শরীরে ভীষণ ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলছে। এর ফলে, এইসব অঞ্চলের অর্ধেকের বেশি মহিলা রক্তাল্পতার শিকার। মায়েদের থেকে এই রক্তাল্পতা ছড়িয়ে পড়ছে শিশুদের শরীরেও। ফলে স্বাভাবিকের থেকে কম ওজনের শিশু বিশ্বে যত জন্মাচ্ছে তার অর্ধেকই জন্মাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে।

রাষ্ট্রসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, বিশ্বজুড়ে অপুষ্টির কারণে শিশুমৃত্যুর হার মহামারীর আকার নিয়েছে। বিশ্বে প্রতি বছর যে ৫৬ লক্ষ শিশু অপুষ্টির কারণে প্রাণ হারাচ্ছে, তার মধ্যে ২১ লক্ষ ভারতেই।

‘ইউনিসেফ’ ২০০৫ সালের রিপোর্টে বলেছিল, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, পানীয় জল ও বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত। ৬৩ শতাংশ শিশু একপেট খিদে নিয়ে রাতে শুতে যায়। এই শিশুদের ৫৩ শতাংশই স্থায়ী অপুষ্টির শিকার। বলা হয়েছে, এদেশের প্রায় ৩ কোটি শিশু ফুটপাতের নোংরা এবং দূষিত পরিবেশে জন্ম নেয়, সেখানেই জীবন কাটায়। নিউমোনিয়া, ডায়ারিয়া বা ধনুষ্টঙ্কারের মত রোগ যা সহজেই প্রতিরোধ করা যায়, সেই সমস্ত রোগে ভুগে এদেশের বিপুল সংখ্যক শিশুর মৃত্যু হয়। দেড় কোটির বেশি শিশু ভিটামিন ‘এ’-র অভাবে দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতায় ভোগে।

পুঁজিবাদী, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশের শিশুমৃত্যুর ওপর ইতিপূর্বেই সমীক্ষা চালিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং বাল্টিমোরের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল। ঐ গবেষকরা বলেছেন, ‘‘বিশ্বে প্রতিটি শিশুকে পেটভরে খাওয়াতে পারলেই এ ট্রাজেডি ঠেকানো যেত।’’ কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি শিশুকেই পেট ভরে খাওয়ানো যাবে কী করে? পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের বিশ্বব্যাঙ্ক, আই এম এফ প্রভৃতি ঋণদানকারী সংস্থাগুলির নির্মম শোষণে লুণ্ঠনে একদিকে মালিকশ্রেণীর মুনাফা তথা সম্পদ যেমন দ্রুতহারে বিপুলায়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ঠিক তেমনি দ্রুতহারে বাড়ছে ভীষণ দারিদ্র্য, বেকারি। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ফারাকটা দ্রুতহারে বাড়ছে। পরিবারে দারিদ্র্য ও অনাহার থাকবে অথচ সেটা দূর না করে শিশুরা পুষ্টিকর খাবার পাবে — একথা একমাত্র মূর্খরাই কল্পনা করতে পারে এবং একমাত্র শয়তানেরাই প্রচার করতে পারে। ভারতবর্ষে যেমন ‘বিলিওনিয়ার’ বাড়ছে, তাদের সম্পদ দ্রুতহারে বাড়ছে, তেমনি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দারিদ্র্য, বেকারি, অনাহার, অপুষ্টি। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও গ্রামবাংলায় মোট কৃষক পরিবারের প্রায় ৬০ শতাংশই জমিহীন। এখানে গ্রামীণ খেতমজুর সরকারি হিসেবেই ৭৩ লক্ষেরও বেশি, বেসরকারি মতে প্রায় এক কোটি। অন্য রাজ্যের মত এ রাজ্যেও কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। অভাবের জ্বালায় বাবা-মা তাদের কন্যাসন্তান বেচে দিচ্ছে।

রাজ্য সরকারেরই ব্লক ভিত্তিক সমীক্ষার রিপোর্ট — রাজ্যের ৪৬০৪টি গ্রামে বছরে দু-তিন মাস চলে অনাহার। অর্থাৎ বাকি ৯-১০ মাস চলে অর্ধাহার। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকা থেকে অনাহারে, রোগে ভুগতে ভুগতে মৃত্যুর মিছিল ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। এইসব পরিবারের শিশুরা পুষ্টিকর খাদ্য পাবে কোথা থেকে? কেবল শিশুদের জন্য পুষ্টি জোগানোর যত স্লোগান রাষ্ট্রসংঘ বা ইউনিসেফ উচ্চারণ করুক না কেন — তা বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছু নয়। এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’-র স্লোগান, ‘‘২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য’’, শিশুর পুষ্টির জন্য মায়ের পুষ্টি চাই, পরিবারের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য চাই, পেটভরা খাদ্য চাই। সেটা মিলবে কি? দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার অনেক বছর ধরেই বেশি। তবু মানুষ অভুক্ত কেন? এ প্রশ্নের উত্তর রাষ্ট্রসংঘ দেবে কি? যারা সর্বস্ব লুঠ করে সাধারণ মানুষকে চরম দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিক্ষেপ করছে, তারাই আবার শিশুর অপুষ্টি ও শিশুমৃত্যু আটকাতে হবে বলে বিশ্বময় প্রচার করছে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করছে। শুধু ভাল ভাল ঘোষণা শুনে সেই প্রতারকদের চিনতে যেন আমরা ভুল না করে বসি। ইউনিসেফ-এর ভারতীয় প্রতিনিধি সেসিলিও এডোর্না বলেছেন, অপুষ্টি মোকাবিলার জন্য ভারতবর্ষে প্রবল সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে থেকে যাচ্ছে বিস্তর ব্যবধান (দি টেলিগ্রাফ, ৪-৫-০৬) অর্থাৎ নেতা-মন্ত্রীরা কেবল ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে ভোট কুড়োচ্ছেন। মার্কিন শাসকরা যেমন শিশুর অপুষ্টিজনিত মৃত্যু নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চোখের জল ফেলছে, ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের শাসকরাও দারিদ্র্য ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে তেমনতর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আসলে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠনেরই যে অনিবার্য ফল এই অপুষ্টি, দারিদ্র, বেকারি এবং শিশুমৃত্যু — নেতা-মন্ত্রীরা সেই সত্যকে আড়াল করতেই নানা টোটকা হাজির

আটের পাতায় দেখুন

ফ্রান্সের ছাত্ররা প্রমাণ করল আন্দোলন করেই কিছু হয়

জয় হল ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের। মাথা নত করতে বাধ্য হল ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকার। গোটা ফ্রান্স জুড়ে এখন ছাত্র-যুবক-শ্রমিকদের মধ্যে বিজয় উল্লাস। আন্দোলনের বিজয় বার্তা ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে। গোটা বিশ্বের শোষিত নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষ এই আন্দোলনের সাফল্যে আনন্দিত। এই আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্বব্যাপী। কারণ গোটা বিশ্বের শোষিত মানুষ অবিচ্ছেদ্য শ্রেণীস্বার্থে আবদ্ধ। সকলেই আন্দোলন চায়, লড়াই চায়, কারণ লড়াই ছাড়া পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকল থেকে তাদের সামনে মুক্তির দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। সেই কারণে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে শোষিত মানুষ এই আন্দোলনের সাফল্যে পুলকিত, আনন্দিত।

ভারতের শোষিত মানুষের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনকে অভিনন্দন। আজ পুঁজিবাদের স্তাবকরা যে বলে, পুঁজিবাদই মানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি শান্তি দিতে সক্ষম, সেটা যে একটা নির্লজ্জ মিথ্যাচার তারই সাম্প্রতিক প্রমাণ ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলন।

উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশ ফ্রান্স। পুঁজিপতিদেরই এখানে আকাশছোঁয়া উন্নতি। এই উন্নতির মূলে রয়েছে ফ্রান্সে ও ফরাসি উপনিবেশগুলিতে নির্মম শ্রমিক শোষণ। উপনিবেশগুলিতে পুরনো আধিপত্য নেই, বিশ্ববাজারে রয়েছে মার্কিন চাপ, দেশের বাজার সঙ্কুচিত। ফলে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দেশের মতই ফ্রান্সেও লকআউট ক্লোজার এবং তীব্র বেকার সমস্যা। গোটা ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে বেকার সমস্যা তীব্রতম। ফ্রান্সে প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ বেকার। তরুণদের মধ্যে বেকারের হার প্রায় ২৩ শতাংশ। শহরতলিগুলিতে বেকারের হার প্রায় ৪০ শতাংশ। গত নভেম্বর মাসে ফ্রান্সে যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছিল তার মূলেও ছিল তীব্র বেকার সমস্যা। এবারের ছাত্র আন্দোলনের পেছনেও মূল কারণ হল কর্মহীনতা।

পুঁজিবাদই বেকার সমস্যার জনক এটা পুঁজিপতিরা বুঝতে দিতে চায় না। তারা সর্বদা দেখাতে তৎপর পুঁজিবাদের মধ্যেই বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব। তারা বলে, আইন কানুনে কিছু সংস্কার করে দিলে চাকরি হবে সহজলভ্য। ফরাসী সরকারও প্রতারণার এহেন পথই নিয়েছে। বেকার যুবকদের জন্য চাকরির সোনালী সুযোগ সৃষ্টির বাগাড়ম্বর করে ভিলপ্যাঁ সরকার এক নতুন আইন প্রণয়ন করে। এই আইনে নিয়োগকর্তাদের অধিকার দেওয়া হয় যে, ২৬ বছরের কম বয়সী যুবকদের চাকুরি দেওয়ার ২ বছরের মধ্যেই কোনও কারণ না দেখিয়ে ছাঁটাই করা যাবে। যার অর্থ, ২ বছরের ঠিকায় চাকরি। এইভাবে ছাঁটাই করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার ভিলপ্যাঁ সরকারের শয়তানি বুদ্ধি ফ্রান্সের ছাত্রযুবকদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। ফ্রান্সের ছাত্রযুবকরা মুখের উপর জবাব দিয়ে বলে, তারা দু’বছরের চাকরির বিনিময়ে সারা জীবনের বেকারত্ব চায় না। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে রাস্তায়। ফ্রান্সের ৮৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৪টিই চলে যায় আন্দোলনকারীদের দখলে। প্যারিস, বোর্দো, রেনে, নাঁসি প্রভৃতি ফ্রান্সের প্রায় সব শহরেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভে সামিল হয় শ্রমিক কর্মচারীরাও। ‘ওটা ছাত্রদের আন্দোলন, আমরা শ্রমিকরা যাব কেন’ — সঙ্কীর্ণতার এহেন ঘেরাটোপে শ্রমিক কর্মচারীরা নিজেদের আবদ্ধ রাখেনি। ‘ছাত্রদের আন্দোলন তাতে আমাদের কী’ — এরূপ ভেবে শিক্ষকরাও বসে থাকেননি। তাঁরাও ছাত্র আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। ২৫ লক্ষ, ৩০ লক্ষ মানুষের মিছিল হয়েছে প্যারিসের রাস্তায়। চলেছে জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ। ২৮ মার্চ ও ৪ এপ্রিল দেশজুড়ে পালিত হয়েছে ধর্মঘট। শেষপর্যন্ত অনড় সরকার, দাম্ভিক সরকার ছাত্র আন্দোলনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। দীর্ঘ টালবাহানার পর ১০ এপ্রিল এই বিতর্কিত আইন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করা হয়।

বিপ্লবের আঁতুড়ঘর হিসাবে খ্যাত ফ্রান্স। এখানেই পতন হয়েছে স্বৈরাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গের। শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৮৭১ সালে ফ্রান্সেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পারি কমিউন। সেই ফ্রান্সের ছাত্ররাই আবার মাথা নত করাল ভিলপ্যাঁর বুর্জোয়া সরকারকে এমন একটা সময়ে যখন বিশ্বের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা দম্ভের সাথে ঘোষণা করেছে ‘আন্দোলনের দিন শেষ, পুঁজির হুকুমই শেষ কথা।’

আন্দোলনের জমি তলে তলে তৈরি হচ্ছিল। গত ১৫/১৬ বছর ধরে যে সংস্কার কর্মসূচি ফরাসী সরকার চালাচ্ছিল সাধারণ মানুষ তা মেনে নিতে পারেনি। ভারতের মতো ফ্রান্সেও বুর্জোয়া সরকার সংস্কারের মানে দাঁড় করিয়েছে জনসাধারণকে দেওয়া সুবিধাগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ করা। সংস্কারের প্রবক্তারা বলেছে সাধারণ মানুষের ভালর জন্য এসব করা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে এই সংস্কার তাদের সর্বনাশই ঘটাবে। এই ধরনের সংস্কারের বিরুদ্ধে লাতিন আমেরিকাতেও বিক্ষোভ দানা বাঁধছে। বিক্ষোভের অগ্নিবলয় ফ্রান্সেও তৈরি হয়েছিল যা ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরিত হয় এবং সরকারকে মাথা নত করায়।

ফ্রান্সের ছাত্র ও জনগণের এই তুমুল আন্দোলন ও তার বিজয় শুধু ফ্রান্সের নয়, বিশ্বের সকল পুঁজিবাদী দেশের শাসকদের বুকেই কাঁপন ধরাবে। বেকারসমস্যা সমাধান করার নামে শ্রম আইনের তথাকথিত সংস্কার করার যে পথে ফরাসি সরকার পা ফেলছিল, সব দেশের বুর্জোয়া শাসকরাই এখন সেই পথের পথিক। পুঁজিবাদের নয়া উদারনৈতিক মডেল অনুযায়ী এখন ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ, কম মজুরি, যেমন খুশি ছাঁটাই, স্থায়ী কাজের বদলে ঠিকায় কাজ প্রভৃতিকেই উন্নয়নের তথা বেকার সমস্যা সমাধানের নয়া ফর্মুলা রূপে দেখানো হচ্ছে, দুনিয়াজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যম মানুষকে বোঝাচ্ছে যে, এই পথেই মানুষের উন্নয়ন ঘটবে। এক সময়ের বামপন্থী, এমনকী কমিউনিস্ট নামধারীরাও এখন এই সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষণ পরিকল্পনার পক্ষে দাঁড়িয়েছে, ফলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। এজন্যই পুঁজিবাদী শোষণের নির্মমতা শ্রমিক কর্মচারী সাধারণ মানুষের জীবনকে ছারখার করে দিলেও তার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারছে না। ভারতের ক্ষেত্রে সিপিএম-সিপিআই-এর মত দলগুলির বিশ্বাসঘাতকতাই এজন্য প্রধানত দায়ী। এই পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের আন্দোলন যথার্থই পুঁজিবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের শিবিরে এক প্রবল আঘাত। ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস, বেকারি ইত্যাদি মুখ বুঁজে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই — একথা যারা প্রচার করে, ফ্রান্সের গণআন্দোলনের বিজয় তাদেরও যোগ্য জবাব দিয়ে প্রমাণ করেছে, ন্যায্য দাবিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে দৃঢ়তার সাথে যদি আন্দোলন করা যায় তবে দাবি আদায় করা সম্ভব। এই শিক্ষাকে গ্রহণ করে ভারতের বুকে তেমন আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলাই হবে এই মুহূর্তের জরুরি কাজ।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

মে দিবস উদ্‌যাপন

মহারাষ্ট্র

মে দিবসে নাগপুরে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র দপ্তরে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমরেড রবীন্দ্র সাখরে। পরে ভ্যারাইটি চক থেকে বেরিয়ে একটি শ্রমিক মিছিল বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে ভ্যারাইটি চকের জনসভায় পৌঁছায়, সেখানে ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর নেতা কমরেড মাধব ভোগে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন চন্দ্রা, মুকুন্দরাও পালটকর, নন্দিনী ভোগে, নীলিমা ভালেরাও, লক্ষ্মীবাঈ, বিজুবাঈ, প্রভা ভজন, শ্রীমতী শোভা প্রমুখ। ভিওয়ান্ডির আমপাড়া-খাণ্ডুপাড়ায় মে দিবসে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সেভ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড লেবার রাইট্‌স কমিটির উদ্যোগে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড নাসিমা আহমেদ। সভার সঞ্চালক ছিলেন কমরেড কে কুলশ্রেষ্ঠ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সত্যবান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর মুম্বই কমিটির ইনচার্জ কমরেড এ কে ত্যাগী এবং অ্যাডভোকেট শামিম আহমেদ আজমী। হাজার হাজার মানুষ মে দিবস পালন করেন এবং সভায় অংশগ্রহণ করেন।

মধ্যপ্রদেশ

১ মে সকালে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে জবলপুরে কাঁচঘর চকে কমরেড ভবানী ঘোষ রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। বিকালে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই টি ইউ সি, সিটু, এইচ এম এস, কাউন্সিল অফ ট্রেড ইউনিয়নস্, কেন্দ্রীয় কর্মচারী সমন্বয় সমিতি প্রভৃতি সংগঠনগুলির এক যুক্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে সুপার মার্কেটের জনসভায় মিলিত হয়। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষে কমরেড বিনোদ খরে।

ফ্যাসিস্ট জার্মান শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজয় দিবসে মস্কোতে ৯ মে'র মিছিল

মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী উল্টাডাঙা-কাঁকুড়গাছি-সল্টলেক জোনাল কমিটির ডাকে ১০ মে কলকাতার বাগমারি বাজারের জনসভায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ

রাজ্যে রাজ্যে ২৪ এপ্রিল উদযাপন

ছত্তিশগড়

প্রতিষ্ঠা দিবসে দুর্গ-এর তিতুরডিতে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্ষীয়ান নেতা কমরেড বাদশা খান প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড লীলাময় মণ্ডল।

মধ্যপ্রদেশ

দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে জবলপুর কার্যালয়ে রাখেন বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্কর, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অরুণ কুমার সিং। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিবলাল প্রসাদ। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেডস এস কে পাণ্ডে, দীপক কুমার, রামাধীন সিং, রামসুরত ঠাকুর, যোগেন্দ্র রাম প্রমুখ।

২৪ এপ্রিল পাটনার সভায় ভাষণ দিচ্ছেন বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড শিবশংকর

ভয়াবহ শিলাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে কে কে এম এসের ডেপুটেশন

গত ২৪ এপ্রিল, তৃতীয় দফা বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক ৪ দিন আগে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমা ও সংলগ্ন নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে কালবৈশাখী ও ব্যাপক শিলাবৃষ্টিতে হাজার হাজার চাষীর ভবিষ্যৎ সঙ্কটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এদিনের ব্যাপক শিলাবৃষ্টিতে অশোকনগরের (হাবড়া ব্লক-২) ভুলকুণ্ডা, শ্রীকৃষ্ণপুর ও বাঁশপুল অঞ্চল এবং পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের চাষজমির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ অঞ্চলের ধান, পাট ও সব্জী চাষের প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদে ঋণ নিয়ে চাষ করা চাষীর কাছে এ এক মারাত্মক আঘাত। ভোটের সময় অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল যখন ভোটের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত, তখন ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পাশে এসে দাঁড়ায় 'কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন'। কে কে এম এসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন গ্রামের কৃষকদের সংগঠিত করে হাবড়া ব্লক-২ এর বিডিও'র কাছে ৩ মে ফসলের ক্ষতিপূরণের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিন শতাধিক কৃষকের এই ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ তারক দাস, আবদুল খায়ের মণ্ডল, রবীন আইচ, নজরুল মণ্ডল ও সুকুমার চক্রবর্তী। ২ মে হরিণঘাটা বিডিও'র কাছে অনুরূপ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন কমরেডস্ কমল মুন্সি, আবের আলি মণ্ডল, প্রভাত পাল প্রমুখ।

জলসমস্যা সমাধানের দাবিতে পুরুলিয়ায় গণঅবস্থান

গরম পড়তে না পড়তেই সারা জেলার সাথে পুরুলিয়া পৌরসভায় চলেছে চরম জলসঙ্কট। পানীয় জল তো বটেই, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য শহরের মানুষ যে জলাশয়গুলি ব্যবহার করত, পৌরসভার অবহেলায় সেগুলিও বর্তমানে মৃতপ্রায়। পৌরসভা নির্বাচনে সিপিএম এবং কংগ্রেস — দু'পক্ষেরই প্রতিশ্রুতি ছিল পানীয় জল সমস্যার সমাধান, কিন্তু নির্বাচন পরবর্তীকালে সে সমস্যা বৃদ্ধিই পেয়েছে।

এমতাবস্থায় শহরে জলসমস্যা সমাধানের দাবিতে ৮মে এস ইউ সি আই পুরুলিয়া শহর লোকাল কমিটির আহ্বানে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত গণঅবস্থান সংগঠিত হয়। দুই শতাধিক মানুষের এই অবস্থানে মা-বোনেদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। অবস্থানে এস ইউ সি আই-এর জেলা নেত্রী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য সহ আঞ্চলিক কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কমরেড সুব্রত মুখার্জীর নেতৃত্বে দশ সদস্যের প্রতিনিধি দল পৌরপ্রধানকে ডেপুটেশন দেয়। পৌরপ্রধান নতুন টাইমকল চালু, টিউবওয়েল মেরামত করা সহ বেশ কিছু দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

ঝাড়খন্ড

রাঁচির বিধানসভা হলে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় প্রধানবক্তা ছিলেন দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রঞ্জিত মোদক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড্‌স রবীন সমাজপতি, রামলাল মাহাতো, আর এস শর্মা, এস বি সিং, সীতারাম টুডু, বিমল দাস, কে পি সিং প্রমুখ।

বিহার

পাটনায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তব্য

'ধনী' ভারতবর্ষ আফ্রিকার স্তরে নেমেছে

সাতের পাতার পর

করছেন। ওঁরা যতই প্রতিশ্রুতি বিলোচ্ছেন ততই দারিদ্র্য বাড়ছে, শিশু ও মায়ের অপুষ্টি বাড়ছে, মৃত্যু বাড়ছে। মনে রাখতে হবে, অপুষ্টিজনিত শিশুমৃত্যু প্রতিহত করতে হলে চাই সম্পদের সমবণ্টন। সেজন্য পুঁজিবাদী লুণ্ঠন উচ্ছেদের সংগ্রামকেই শক্তিশালী করতে হবে। গণআন্দোলন তথা বিপ্লবী আন্দোলনের জোয়ারে নিজেদের সামিল করতে হবে। শুভ ইচ্ছা, শুভ কামনা, শিশু ও মায়ের পুষ্টির জন্য বিশেষ সাহায্যের ও চিকিৎসার প্যাকেজ — এসব হচ্ছে দগদগে ক্ষতে প্রলেপ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in